আহারান্তে অগ্নি বা রৌদ্রের তাপ লাগান এবং অশ্বাদি যানে আরোহণ পূর্ব্বক ভ্রমণ প্রভৃতি শ্রমজনক কার্য্য অহিতকর।

জলপান,—শরীরে জলের যতটুকু আবশ্যকতা ঘটে তাহার অধিকাংশ খাদ্য ও জলীয়ের সহিত উদরস্থ হয়, তদ্ব্যতীত বিশুদ্ধ জল পান করিয়াও আমরা তাহার কিয়দংশ পূরণ করি। শাস্ত্রে শরৎ ও গ্রীষ্মকাল ভিন্ন অন্য ঋতুতে সুস্থ ব্যক্তিকেও অল্প মাত্রায় জলপান করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। আহারের পূর্ব্বে জল পান করিলে শরীর কৃশ এবং আহারের পরে জলপান করিলে শরীর স্থূল হইয়া থাকে।

শাস্ত্রে আন্তরীক্ষ-গাঙ্গ নামক জলকেই উৎকৃষ্ট বলা হইয়াছে। যে আন্তরীক্ষ-জল রজত পাত্রস্থিত শাল্যন্নকে ক্লিন্ন করে না, তাহাকে গাঙ্গ-জল বলে। এতদ্ভিন্ন অন্য আন্তরীক্ষ-জলকে সামুদ্র বলে। সামুদ্র এবং আন্তরীক্ষ-জল আশ্বিন মাস ব্যতীত অন্য সময়ে পান করিতে নাই।

আন্তরীক্ষ-জলের অভাবে ভৌম জল গ্রহণ করিতে হয়। মৃত্তিকা ভেদে এবং নাদেয়, কৌপ প্রভৃতি ভেদে জলের নানা প্রকার গুণ শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে। অনাবশ্যক বিবেচনায় সে সমস্ত লিখিত হইল না। ভৌম (ভূমি জাত) জল প্রাতঃকালে গ্রহণ করিতে হয়। যে জল আস্বাদন ও গন্ধহীন, বিবর্ণ নহে, স্বচ্ছ এবং মল রহিত—তাহাই বিশুদ্ধ। বিশুদ্ধ জলের অভাবে অবিশুদ্ধ জল অগ্নিতে সিদ্ধ করিয়া স্থূল বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে।

পিত্ত-প্রধান ব্যক্তির পক্ষে শীতল জল; বায়ু ও কফ প্রধান ব্যক্তির পক্ষে ঈষদুষ্ণ জল হিতকর। দিবসের সিদ্ধ জল—রাত্রিতে এবং রাত্রির সিদ্ধ করা জল দিবসে ব্যবহার করা উচিত নহে।

বর্ষাকালে নদীর জল কর্দ্দম এবং বিবিধ প্রাণীর লালা, মূত্র, অণ্ডাদি দ্বারা দূষিত হয় বলিয়া সে সময়ে নদীর জল ব্যবহার করা উচিত নহে। শরৎকালে সর্ব্বপ্রকার ভৌম জল হিতকর হইয়া থাকে।

তৃষিত ব্যক্তি জল না পাইলে মোহ প্রাপ্ত হয় এবং মোহ হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে, সেইজন্য কোন অবস্থাতেই জল পান নিষেধ করা উচিত নহে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, রোগ প্রতিকার এবং দীর্ঘ জীবন লাভের উপায় স্বরূপ বহুবিধ নীতি—ধর্ম্ম শাস্ত্রের আদেশ অবশ্য পালনীয় বলিয়াই সম্ভবতঃ আয়ুর্ব্বেদে ঐ সকলের পুনরুক্তি করা হয় নাই। অথবা ধর্ম্মশাস্ত্রের বিবিধ বচন যখন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, তখন হয়ত সে সকল বিষয়ও আয়ুর্ব্বেদের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। বহুকালব্যাপী বিপ্লবের ফলে সেই সকল গ্রন্থ বা গ্রন্থাংশ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। নচেৎ এরূপ নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে সূক্ষ্মদর্শী আয়ুর্ব্বেদকারগণের দৃষ্টি পতিত হয় নাই,—ইহা সম্ভবপর নহে।

মনু সংহিতায় লিখিত হইয়াছে;—"জলে—মূত্র, পুরীষ, থুথু, পূয়াদি অমেধ্য বস্তু-লিপ্ত দ্রব্য, রক্ত বা বিষ নিক্ষেপ করিবে না। এই বিধি পালন করিলে—পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ কলেরা রোগের প্রতিষেধের জন্য যাহা প্রধান উপায় বলেন—তাহা অবলম্বন করা হয়। তাঁহাদিগের মতে কলেরা রোগীর মল কোনরূপে জলে মিশ্রিত হইলে রোগের সংক্রমন ঘটে। এই উপদেশ পালন করিলে ইহা ঘটিতে পারে না।"

মনু সংহিতায় আরও লিখিত আছে;—

"মূত্র, পা ধোয়া জল, উচ্ছিষ্টান্ন, শুক্র প্রভৃতি গৃহ হইতে দূরে (একটী তীর ছুড়িলে যত দূর যায়—তত দূরে) পরিত্যাগ করিবে। এই বিধি পালন করিলে গৃহাদি পবিত্র থাকে,—কোনরূপ আবর্জ্জনা গৃহের নিকটে জমিতে পায় না, কোনরূপ দুর্গন্ধ আঘ্রাণ করিতে হয় না এবং স্বাস্থ্য ভাল থাকে।" বাহুল্য ভয়ে আমরা অধিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম না। অনুসন্ধিৎসু পাঠক মনু সংহিতা পাঠ করিলে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত বহু স্বাস্থ্য-নীতি নিহিত আছে তন্মধ্যে দেখিতে পাইবেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, গৃহাদি নির্ম্মাণ করা সম্বন্ধে পূর্ব্বে আমাদের দেশে এরূপ সুনিয়ম ছিল যে, সেই সকল নিয়মানুসারে গৃহ নির্ম্মাণ করায় গৃহমধ্যে যথেষ্ট বায়ু ও রৌদ্রের সমাবেশ ঘটিত। সেই নিয়ম অনুসারে এই কারণেই আজিও দক্ষিণদ্বারী ঘর-ঘরের রাজা এই প্রবাদ বাক্যের প্রচলন দেখা যায়।

আয়ুর্ব্বেদের সদাচার বিধি রোগ প্রতিষেধক এবং দীর্ঘ জীবন লাভ সম্বন্ধীয় নীতির অন্তর্ভুক্ত। এই জন্য সদাচার বিষয়ক কয়েকটী নীতি লিখিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

নিত্য পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করিবে, প্রসন্নমনা ও সুগন্ধধারী হইবে। শ্রান্তি বোধ হইবার পূর্ব্বেই শ্রমজনক কার্য্য পরিত্যাগ করিবে। দুষ্ট ঘোটকাদি-যানে আরোহণ করিবেনা। উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের প্রতি চাহিয়া থাকিবেনা। ঊর্দ্ধ জানু হইয়া অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিবেনা। শ্রান্তি দূর না হইলে স্নান করিবেনা। স্নান করিয়া সেই বস্ত্র পরিধান করিয়া, অধিকক্ষণ থাকিবেনা। শরীর বক্রভাবে রাখিয়া হাঁচিবেনা, আহার করিবেনা এবং শয়ন করিবেনা।

চঞ্চল মনকে অধিকতর চঞ্চল করিবে না। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অতি চালনা করিবেনা। অতিশয় দীর্ঘসূত্রী হইবেনা। ক্রোধ ও হর্ষের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিবেনা। শোকের বশীভূত হইবে না। কার্য্য সিদ্ধিতে অত্যন্ত আনন্দিত কিংবা কার্য্যের অসিদ্ধিতে অত্যন্ত দুঃখিত হইবে না। কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে নিশ্চিত-বুদ্ধি হইবে অর্থাৎ এইরূপ কার্য্য করিলে এইরূপ ফল হইবে ইহা নিশ্চয় বুঝিবে।

হর্ষ-পরায়ণ হইবে, অর্থাৎ সর্ব্বদা আনন্দিত চিত্তে কাল অতিবাহিত করিবে। ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ হইবে। উপেক্ষা পরায়ণ হইবে অর্থাৎ মান-অপমান, জয়-পরাজয়, সুখ-দুঃখ প্রভৃতিতে উত্তেজিত বা ক্লিষ্ট না হইয়া, সমভাবাপন্ন হইবে, কিছুতেই মনের শান্তিকে নষ্ট হইতে দিবে না।

রসায়ন ও বাজীকরণ।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রোক্ত রসায়ন এবং বাজীকরণ—দুইটী অপূর্ব্ব পদার্থ। দুঃখের বিষয় আজকাল বাজীকরণ আদৃত হইলেও রসায়নের ব্যবহার এক প্রকার লোপ পাইয়াছে। অপিচ, বাজীকরণ-ঔষধ প্রচলিত থাকিলেও অল্পব্যয় সাধ্য এবং সহজলভ্য বাজীকরণ ঔষধের প্রচার

নিতান্ত কম। চিকিৎসকের নিকট—যে সকল বাজীকরণ ঔষধ কিনিতে পাওয়া যায়,—সেগুলি বহুমূল্য। এই প্রবন্ধে আমরা রসায়ন ও বাজীকরণ ঔষধ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। প্রথমে রসায়নের বিষয় কথিত হইতেছে।

রসায়ন ঔষধ দুই প্রকার, কতকগুলি সুস্থ ব্যক্তির ওজোবর্দ্ধক এবং কতকগুলি রুগ্নের রোগ নাশক। যে সমস্ত ঔষধ সুস্থ ব্যক্তির ওজোবর্দ্ধক, সেইগুলি রসায়ন ও বাজীকরণ নামে খ্যাত।

রসায়ন ও বাজীকরণ প্রধানতঃ সুস্থ ব্যক্তির জন্য কল্পিত হইলেও রোগীর রোগ প্রশমনের জন্যও উপযুক্ত ক্ষেত্রে ঐ সকল ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যদুক্তং চরকে,—

প্রায়ঃ প্রায়েণ রোগাণাং দ্বিতীয়ং প্রশমেমতং।
প্রায়োঃ শব্দো বিশেষার্থেঽভ্যয়ং হ্যভয়ার্থকৃৎ॥

অর্থাৎ রসায়ন প্রায় সকল প্রকার রোগ-নাশক। কিন্তু প্রায় শব্দ এখানে বিশেষার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, কারণ দুইটাই (রসায়ন এবং বাজীকরণ) সুস্থের ওজোবর্দ্ধক এবং রুগ্নের রোগাপহরণ—এই উভয় কার্য্য সাধক।

রসায়ন ঔষধ প্রায় সর্ব্বপ্রকার রোগনাশক—এই কথায় কেহ এমন বুঝিবেন না যে, নবজ্বরে, সান্নিপাতিক জ্বরে, বা অতিসারে রসায়ন ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। পাছে কেহ এইরূপ মনে করেন—সেই জন্য শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—"সুস্থব্যক্তির ওজস্কর ঔষধের বিষয় বলা যাইতেছে। যে সকল ব্যাধিনাশক তাহা চিকিৎসা স্থানে বলা যাইবে। রোগ সমূহের যাহা ঔষধ তদ্বারাই চিকিৎসা করা যায়।"

এখন সহজেই মনে হইতে পারে, পূর্ব্বে বলা হইল যে, রসায়ন ঔষধ প্রায় সমুদায় রোগনাশক, এবং পরে বলা হইল যে, ভিন্ন ভিন্ন রোগের যে সকল ঔষধ,—তদ্বারাই তাহাদের চিকিৎসা করিবে। ইহাতে বুঝিবে কি?

ইহার মীমাংসা এই;—রোগনাশের জন্য রোগনাশক ঔষধ এবং সুস্থের ওজোবর্দ্ধন জন্য রসায়ন ও বাজীকরণ ঔষধ প্রধানতঃ প্রয়োজ্য। কিন্তু রসায়ন ও বাজীকরণ বিশেষতঃ রসায়ন ঔষধ-প্রয়োগ দ্বারা অধিকাংশ রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। রসায়নের রোগনাশকতা সম্বন্ধে একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

গত বর্ষের ২য় ও ৩য় সংখ্যক "আয়ুর্ব্বেদে" "হরীতকী" শীর্ষক প্রবন্ধে ঋতু হরীতকী নামক রসায়নের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। অপিচ, উক্ত প্রবন্ধে হরীতকী যে সকল রোগ-নাশে সক্ষম, তাহাও বলা হইয়াছে। এতদ্বারা বুঝা যায়—হরীতকী যে সকল রোগনাশে সক্ষম, ঋতু হরীতকী সেবনে সেই সকল রোগ নিরাকৃত হয়। কিন্তু এইটুকু বুঝিলেই চলিবে না। ঔষধ প্রয়োগ সর্ব্বত্রই যুক্তির উপর নির্ভর করে। কারণ হরীতকী-গুণ প্রসঙ্গে—হরীতকী অতিসারনাশক বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু অতিসার হইলেই তাহাকে ঋতু হরীতকী প্রয়োগ করা চলে না। বিবদ্ধতাযুক্ত পুরাতন অতিসারে ঋতু হরীতকী ফলপ্রদ। সর্ব্বত্রই এইরূপ বিচার করিয়া রসায়ন ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে।

"যজ্জরা ব্যাধি বিধ্বংসী ভেষজং তদ্রসায়নম্" অর্থাৎ যে ঔষধ জরারূপ ব্যাধি বিধ্বংসী তাহাই রসায়ন।

এস্থলে জরারূপ ব্যাধি-বিধ্বংসী অর্থে জরার প্রতিষেধক,—জরা নাশক নহে। কারণ, জরা-মৃত্যুরূপ স্বাভাবিক ব্যাধির কবল হইতে কেহই রক্ষা পায় না। স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব একদিন ক্ষুণ্ণমনে কার্ত্তিককে বলিয়াছিলেন;—

"মমায়ুর্গ্রসতে কালঃ কুতো পুত্র রসায়নম্।" অর্থাৎ,—হে পুত্র, কাল আমার আয়ুঃ গ্রাস করিতেছে, রসায়ন ঔষধে আর কি ফল হইল!

তবে রসায়ন ঔষধ একেবারে জরার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে না পারিলেও মনুষ্যকে সুদীর্ঘকাল জরার আক্রমণ হইতে অব্যাহত রাখিতে পারে। রোগভোগ, শরীরের প্রতি অত্যাচার এবং অত্যধিক দুশ্চিন্তা প্রভৃতি কারণে মনুষ্য যেমন অকালে জরাগ্রস্ত হয়, সেইরূপ সুনিয়মে থাকিয়া রসায়ন ঔষধ সেবন করিলে মনুষ্য দীর্ঘকাল জরার আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে।

চ্যবন প্রাশ নামক সুপ্রসিদ্ধ রসায়নের ফল-শ্রুতিতে লিখিত হইয়াছে :—

অস্য প্রয়োগাচ্চ্যবনঃ সুবৃদ্ধোঽভূত পুনর্যুবা।

অর্থাৎ,—এই ঔষধ প্রয়োগের দ্বারা বৃদ্ধ চ্যবনঋষি পুনরায় যৌবন লাভ করিয়াছিলেন।

রসায়ন ঔষধ সেবন দ্বারা কি ফল পাওয়া যায়,—সে সম্বন্ধে শাস্ত্রকার লিখিয়াছেন,—

দীর্ঘমায়ুঃ স্মৃতিং মেধামারোগ্যং তরুণং বয়ঃ।
প্রভাবর্ণ স্বরৌদার্য্যং দেহেন্দ্রিয়বলং পরং।
বাকসিদ্ধিং প্রণতিং কান্তিং লভতে না রসায়নাৎ।
লাভোপায়ো হি শাস্তানাং রসাদীনাং রসায়নং॥

অর্থাৎ—রসায়ন ঔষধ সেবন দ্বারা মনুষ্য দীর্ঘ পরমায়ু, স্মৃতি, মেধা, আরোগ্য, (অর্থাৎ রোগ না হওয়া), তরুণ বয়স (অর্থাৎ দীর্ঘ স্থায়ী যৌবন), প্রভা, বর্ণ ও স্বরের উৎকর্ষ; দেহ ও ইন্দ্রিয়ের অতিশয় বল, বাকসিদ্ধি, বিনয় এবং কান্তিলাভ করিতে পারে। উৎকৃষ্ট রসাদি ধাতু লাভের উপায় স্বরূপ বলিয়া ইহা রসায়ন নামে কথিত হইয়াছে।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দীর্ঘ আয়ুঃ প্রভৃতি লাভ করা কি এতই সহজ যে, কেবল মাত্র কিছু ব্যয় করিয়াই রসায়ন সেবন করিলে, দীর্ঘ আয়ু লাভ ঘটিয়া থাকে? যদি তাহা হইত তাহা হইলে পৃথিবী স্বর্গাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ লোক বলিয়া বিবেচিত হইত। রসায়ণ ঔষধের সম্যক ফল লাভ করিতে হইলে বিশেষ আয়াস স্বীকার আবশ্যক।

শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন,—শারীরিক ও মানসিক দোষ রহিত না হইলে মনুষ্য কখনই রসায়ন ঔষধ সেবনের ফলপ্রাপ্তি হয় না। যাহারা শারীরিক ও মানসিক দোষ রহিত এবং সংযতাত্মা—তাহারাই পরমায়ুবর্দ্ধক এবং জরাব্যাধি প্রতিষেধক রসায়নের ফল লাভ করিয়া থাকেন।

শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন,—"যে ব্যক্তি সত্যবাদী, অক্রোধী, মদ্য ও মৈথুন সেবায় বিরত, অহিংস্রক, অধিক পরিশ্রমী নহে, প্রশান্তচিত্ত, প্রিয়বাদী, জপ ও শৌচ পরায়ণ, ধীর, নিত্য দানশীল, তপস্যা পরায়ণ, দেব-গো-ব্রাহ্মণ-আচার্য্য-গুরু ও বৃদ্ধের অর্চ্চনায় রত, ক্রূর কার্য্যে বিরত, নিত্য করুণাশীল, সমভাবে জাগরণ ও নিদ্রাশীল, নিত্য দুগ্ধ ঘৃতসেবী, দেশ কাল প্রমাণজ্ঞ (অর্থাৎ দেশ কাল বুঝিয়া চলেন), যুক্তিজ্ঞ, নিরহঙ্কার, সদাচারী, সঙ্কীর্ণ চিত্ত নহে, এবং যে ইহকাল ব্যতীত পরকাল ভাবিয়া ইন্দ্রিয় সকলের চালনা করে) তাহারই রসায়ন সেবন উচিত।

জিতাত্ম-বৃদ্ধ আস্তিকগণের সেবক এবং ধর্ম্মশাস্ত্র পরায়ণ (অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে চলেন)—সে ব্যক্তি নিত্য রসায়ন সেবনের ফললাভ করিয়া থাকেন।

রসায়নের সম্যক্ ফল লাভ করিতে হইলে যে সকল গুণের প্রয়োজন, অধুনা সেই সকল

গুণের অধিকারী কেহ আছেন কি না সন্দেহ। সুতরাং রসায়ন ঔষধ সেবন অধুনা প্রচলিত হইতে পারে কি না, সে বিষয়ে বিষম সন্দেহ। তবে সেবন একেবারে নিরর্থক হইবার নহে, কাজেই যথাযথ নিয়মে থাকিয়া উহা সেবন করিতে না পারিলেও ইহা সেবনে যে কথঞ্চিৎ ফল পাওয়া যায়, তাহা নিশ্চিত।

এক্ষণে দেখা যাউক—রসায়ন ঔষধ কিরূপ বয়সে সেবন করিলে ফলপ্রদ হইয়া থাকে! শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে :—

পূর্ব্বে বয়সি মধ্যে বা—(অর্থাৎ পূর্ব্ব বয়সে যৌবন কালে) অথবা মধ্য বয়সে (প্রৌঢ়াবস্থায়, রসায়ন ঔষধ সেবন করা উচিত। এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, বালক বা কৃশ—রসায়নের অধিকারী নহে।

রসায়ন ঔষধ সেবন করিতে হইলে পূর্ব্বেই শরীর শুদ্ধ করিয়া লওয়া আবশ্যক।

শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—শুদ্ধ দেহ হইয়া রসায়ন ঔষধ সেবন করা উচিত। কারণ মলিন বস্ত্র রং করিলে যেমন সে রং বেশ লাগেনা, সেইরূপ অবিশুদ্ধ দেহে রসায়ন সেবন করিলে সম্যক্ ফল হয় না।"

এখন কথা হইতেছে যে, শুদ্ধ দেহ কি—এবং অশুদ্ধ দেহই বা কি? সাধারণতঃ আমাদের শরীর অশুদ্ধ। কারণ আমাদের শরীর গ্রাম্য আহার বিহারাদির দ্বারা দূষিত। এই গ্রাম্য-আহার-বিহারাদি বশতঃ শরীরের যে দোষ জন্মে, বমন-বিবেচনাদি দ্বারা সেই দোষ সংশোধন করিয়া, পরে রসায়ন ঔষধ সেবন করিতে হয়।

রসায়নের প্রয়োগ দুই প্রকার। এক কুটী প্রাবেশিক, অপর বাতাতপিক। কুটী প্রাবেশিক বিধি যেরূপ কঠিন, তাহাতে অধুনা কেহ যে কুটী প্রাবেশিক বিধি অনুসারে রসায়ন সেবন করিতে পারিবেন, এরূপ মনে হয় না। শাস্ত্রে কথিত আছে, যাঁহারা সমর্থ, নীরোগ, ধীমান্, সংযতাত্মা, সহিষ্ণু এবং ধন-জনসম্পন্ন,—তাঁহাদের পক্ষে কুটী প্রাবেশিক রসায়নই প্রশস্ত। অন্যান ব্যক্তির পক্ষে সৌর্য্য মারুতিক অর্থাৎ বাতাতপিক রসায়ন সেবন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু বাতাতপিক অপেক্ষা কুটী প্রাবেশিক রসায়ন শ্রেষ্ঠ, কিন্তু উহা দুষ্কর।

কুটী অর্থাৎ গৃহমধ্যে থাকিয়া বাতাতপ বর্জ্জন করিয়া ঔষধ সেবন করিতে হয় বলিয়া উহাকে কুটী প্রাবেশিক রসায়ন বলে। কুটী প্রাবেশিক বিধি সম্বন্ধে শাস্ত্রে নিম্নলিখিত রূপ উপদেশ আছে।

রাজা, বৈদ্য, ব্রাহ্মণ এবং পুণ্যকর্ম্মা সাধুদিগের আবাসস্থানের নিকটে, সর্পাদির ভয় রহিত, প্রশস্ত রসায়নের আবশ্যকীয় উপকরণযুক্ত এবং উত্তম মৃত্তিকাবিশিষ্ট স্থানে পূর্ব্ব বা উত্তর দিকে কুটী প্রস্তুত করিবে। কুটী বেশ বিস্তৃত ও উচ্চ, ত্রিগর্ভ এবং সূক্ষ্মলোচনা (যাহাতে বহু বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে তজ্জন্য ভিত্তির উপরিভাগে বহু ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত) হইবে। কুটী ঘন ভিত্তিযুক্ত, সকল ঋতুতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং মনের প্রিয় হওয়া উচিত। কুটী যেন স্ত্রীবর্জ্জিত হয় এবং তাহার মধ্যে যেন অপ্রিয় শব্দাদি প্রবেশ করিতে না পারে। উপযুক্ত উপকরণ এবং বৈদ্য, ঔষধ ও ব্রাহ্মণ—কুটীর মধ্যে থাকা উচিত।

অনন্তর উত্তরায়ণ কালে—শুক্ল তিথিতে, শুভ নক্ষত্রে, ক্ষৌরকার্য্যাদি করিয়া, ধৃতিমান, স্মৃতিমান শ্রদ্ধাবল ও সমাহিত চিত্ত হইয়া, রাগদ্বেষাদি মানস দোষ পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্বজীবে মিত্রতা চিন্তা করিয়া, প্রথমে দেবতা ও ব্রাহ্মণ-

গণের পূজা করিবে। পরে দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গো প্রদক্ষিণ করিয়া কুটী প্রবেশ করিবে। কুটীতে প্রবেশ করিয়া প্রথমে বমন-বিরেচনাদি দ্বারা শরীর শুদ্ধ করিয়া লইবে। অনন্তর রসায়ন ঔষধ সেবন করিবে।

ইহার পর কি প্রকারে শরীর শুদ্ধ করিতে হয়, তাহা বলিয়া পরে নানা প্রকার রসায়ন ঔষধের বিষয় লিখিত হইয়াছে। রসায়নার্থ ঔষধ সকল শৈল সত্তম হিমবান পর্ব্বত হইতে গ্রহণ করা উচিত এবং ঐ সকল ওষধি কাল জাত, পূর্ণবীর্য্য ও কোনপ্রকার দূষিত না হয়, এরূপভাবে গ্রহণ করা উচিত—এইরূপ উপদেশ আছে। আমরা অনাবশ্যক বিবেচনায় ঐ সকল বিষয় আলোচনা করিলাম না। তবে কেহ রসায়ন সেবনেচ্ছু হইয়া জানিতে ইচ্ছা করিলে, আমাদের সাধ্যমত উপযুক্ত উপদেশ পাইতে বিলম্ব হইবে না।

রসায়নের জন্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে নানাপ্রকার দিব্য ওষধির উল্লেখ আছে। ঐ সকল ওষধি সম্বন্ধে আমাদের কোনই জ্ঞান নাই এবং উহারা সাধারণ মানবের লভ্য এবং সেব্য নহে। সুশ্রুত গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে, যাহারা অধার্ম্মিক, কৃতঘ্ন, ঔষধদ্বেষী ও ব্রাহ্মণ-দ্বেষী,—তাহারা কদাচ সোমলতা নামক দিব্যৌষধি দেখিতে পায় না। ভগবান আত্রেয় অগ্নিবেশ ঋষিকে নানাপ্রকার দিব্যৌষধি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া পরে বলিয়াছেন,—"দিব্যৌষধির প্রভাব আপনার ন্যায় সুকৃতাত্ম ব্যক্তিই সহ্য করিতে পারে, অকৃতাত্ম ব্যক্তিগণ সহ্য করিতে পারে না।"

দিব্যৌষধি সেবনের যে নিয়ম বলা হইয়াছে, তাহা শুনিলেও ভয় হয়, নিয়ম পালন করাতো বহুদূরের কথা। পাঠকদিগের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য উক্ত বিধির বিষয় লিখিত হইতেছে।

ব্রহ্মা সুবর্চ্চলা, আদিত্যপর্ণী, বা সূর্য্যকান্তা, নারী বা অশ্ববলা, কাষ্ঠ-গোধা, সর্প, সোমলতা, পদ্মা, অজা বা অজশৃঙ্গী, এবং নীলা—এই আট প্রকার ওষধির মধ্যে যাহা পাওয়া যায়, তাহাদের রস তৃপ্তিপূর্ব্বক পান করিয়া, কাঁচা পলাশকাষ্ঠের স্নেহভাবিত সিন্ধুকের মধ্যে উলঙ্গ হইয়া শয়ন করিবে। ঐ সিন্ধুকের উপর যে আবরণ থাকিবে তাহাতে একটী গর্ত্ত করিবে এবং ঐ গর্ত্তের মধ্য দিয়া রসায়ন সেবনকারীর জীবন ধারণার্থ একটু একটু করিয়া ছাগদুগ্ধ পান করিতে দিবে। এইরূপ ভাবে ছয়মাস কাল থাকিলে দেবতার ন্যায় বয়স, বর্ণ, স্বর আকৃতি বল ও প্রভা লাভ করা যায়।

(ক্রমশঃ)

ধল্ আঁকোড়্ বা ধল্ আঁকড়া।

—:০:—

বাতে।—

ধল্আঁকড়ার পাতা বা ছাল প্রলেপ দিলে—
বাতের ফোলা-ব্যথা যায় গো চ'লে।

বিসর্পে।—

ধল আঁকড়ার পাতার রস,
ক্ষতস্থানে দিলে বিসর্প বশ।

মলবদ্ধতায়।—

(১) ধল আঁকড়ার শিকড় আধভরি সিদ্ধ
পান ক'র্‌লে যায় মল বদ্ধ।

(২) সিকি ভরি ধলআঁকড়ার গুঁড়—
গরম জলে সেবন কর।

ইঁদুর ও সর্প বিষে।—

ইঁদুর ও সর্পবিষে
ধল আঁকড়ার পাতা দাও পিষে।
ক্ষেপা কুকুরে কামড়ায় যা'রে—
তা'রও এতে সুফল ধরে।
পাচন ক'রেও ধলআঁকড়ার
খেতে দাও গে বারম্বার।

ফোড়া বসান।—

ধল আঁকড়ার ফল মরিচ সহ—
ফোড়া ব'স্‌বে দিতে কহ।

বাতরক্তে।—

ধল আঁকড়া, অনন্তমূল,
ছাতিমছাল আর গুগ্‌গুল,
এক একটি নাও—আধ্‌ আধ্‌ ভরি,
আধসের জলে সিদ্ধ করি,
একছটাক থা'কৃতে নামিয়ে নিয়ে,
রক্ত দোষে খাও চুমুক দিয়ে।
পারা দোষ, বাত, বাতরক্ত, শূল
কুষ্ঠ পর্য্যন্তের ঘোচে মূল।

ক্রিমিতে।—

(১) ধল আঁকড়ার পাতার রস ছটাক সিকি,
দু'রতি কর্পূরের মিশাও ফাঁকি,
ক্রিমি সারে ক'র্‌লে সেবন,
ধল্‌আঁকড়ার গুণ জেন' এমন।

(২) ধল আঁকড়া, দাড়িমছাল আধ্‌ আধ্‌ ভরি,
সোঁদাল ছাল নাও দ্বিগুণ করি,—
আধ্‌সের জলের একছটাক শেষ,
সেবনে রয়না ক্রিমির লেশ।

শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন।

প্রেরিত পত্র।

(পরীক্ষিত দুইটী ঔষধ।)

(১ম—মূর্চ্ছা বা অপস্মার রোগে।)

আমার জনৈক কবিরাজ বন্ধু একটি রোগীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিতে অসমর্থ হইয়া ডাক্তারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ডাক্তার বাবুকে Ammon carbএর সহায়তায় মুহূর্ত্তমধ্যে রোগীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিতে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন এবং ডাক্তারী চিকিৎসার অশেষবিধ প্রশংসা করিলেন। তিনি আরও বলিলেন, আয়ুর্ব্বেদীয় মতে কি এরূপ একটি ঔষধ আবিষ্কৃত হইতে পারে না? সেইদিন হইতে বন্ধুবরের আগ্রহাতিশয্যে আমি

ডাক্তারী মেটিরিয়া মেডিকা অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এবং অল্পদিনের চেষ্টাতে নিম্নলিখিত ঔষধটি আবিষ্কার করিলাম।

প্রথমতঃ Ammon carb এর প্রস্তুত-প্রণালী লইয়া অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাহাতে কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। একদিন হঠাৎ Liquor Ammonia Fortis এর প্রস্তুত-প্রণালীর প্রতি লক্ষ্য করি এবং নিম্ন লিখিত বিষয়টি জানিতে পারি। "Ammon chloride (নিশাদল) কে Slaked lime (আদ্র চূণ) এর সহিত উত্তপ্ত করিলে য়্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন হইবে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আমি নিশাদলকে আদ্র চূণের সহিত মিশ্রিত করিবামাত্র দেখিলাম যে—একটি গ্যাস উঠিতেছে এবং ঐ গ্যাস ঠিক য়্যামোনিয়ার ন্যায় তীব্র গন্ধবিশিষ্ট। অতঃপর আমি কয়েকটি মূর্চ্ছারোগীকে ইহা প্রয়োগ করিয়া আশানুরূপ সুফল পাইয়াছি। সম পরিমাণ নিশাদল ও আদ্র চূণ লইয়া যে কেহ এই ঔষধটিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। ইহার ঘ্রাণ লইলে মাথার বেদনারও উপকার হয়।

(২য়—প্রদর রোগে)

রোগিণীর বয়স ১৭।১৮ বৎসর। কোন সন্তানাদি হয় নাই। ৩।৪ বৎসর যাবত অনিয়মিত ঋতু স্রাব হইতেছিল। ততদিন কোনরূপ চিকিৎসা নাই। তাহার পর একমাস যাবত অনবরত ঋতুস্রাব হইতে আরম্ভ হওয়ায় ডাক্তারী মতে, পরে আয়ুর্ব্বেদীয় মতে চিকিৎসার ব্যবস্থা করান হয়। কিন্তু কিছুতেই ফল লাভ হয় নাই। ক্রমে রোগিণী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল, ঘন ঘন মূর্চ্ছা হইতে লাগিল। একদিন রোগিণী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছে এরূপ সময়ে আমি চিকিৎসার জন্য আহূত হইলাম। আমার ব্যবস্থায় অনেক চেষ্টায় মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল বটে, কিন্তু রোগিণী বুকের বেদনায় বড়ই অস্থির হইয়া পড়িল। আমি বিশেষ কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া একমাত্রা মকরধ্বজের ব্যবস্থা করিয়া পূর্ব্বে যে সমস্ত ঔষধ সেবন করান হইয়াছিল তাহাই পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। ডাক্তারী মতে পটাশ পার ম্যাঙ্গেনাস্ লোসন্ দ্বারা পিচকারী প্রয়োগ করা হইয়াছিল। সেবনের জন্য কি কি ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল তাহা জানিতে পারিলাম না। পিচ্-কারী প্রয়োগে ২।৩ দিবস কিছু কম থাকিয়া পুনরায় মাংস ধৌত জল সদৃশ অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত অত্যধিক পরিমাণে স্রাব আরম্ভ হইয়াছিল—জানিলাম। সেই সময় আয়ুর্ব্বেদীয় মতে চিকিৎসা করান হয়। যে কবিরাজ মহাশয়কে ডাকা হইয়াছিল, তিনি প্রদরান্তক লৌহ খণ্ডকাদ্য লৌহ, অশোকারিষ্ট, কুটজাষ্টক প্রভৃতি অনেক ঔষধ ও মুষ্টিযোগ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমি সেই ব্যবস্থার উপর অন্য কোন নূতন ব্যবস্থা খুঁজিয়া না পাইয়া রাত্রির জন্য আর একমাত্রা মকরধ্বজ প্রয়োগ করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

রাত্রে আমার মাথায় সহসা এক খেয়াল চাপিল। পরদিবস খানিকটা জলে কিছু ফটকিরী চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা দুই বেলা দুইটি বস্তি (ডাক্তারী মতে পিচ্কারী) প্রয়োগ ও দুই বটি প্রদরান্তক রস (অনুপান আয়াপান রস) ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া আসিলাম। সেবনের জন্য একটি ঔষধ না দিলে নয় বলিয়াই প্রদরান্তক রস ব্যবস্থা করিয়াছিলাম।

তৃতীয় দিবস যাইয়া শুনিলাম, অল্প সামান্য মাত্রায় স্রাব হইয়াছে। পূর্ব্ববৎ ঔষধ ব্যবস্থা

করিয়া চলিয়া আসিলাম। চতুর্থ দিবস স্রাব একেবারেই হয় নাই। ঔষধ পূর্ব্ববৎই রহিল; অধিকন্তু অশোকারিষ্ট ব্যবস্থা করিলাম।

সুখের বিষয় এক সপ্তাহ মধ্যেই রোগিণী অনেকটা সুস্থ হইল। একমাস পর্য্যন্ত উপরোক্ত চিকিৎসা চলিল। মাসাতিবাহিত হইলে দেখা গেল—নিয়মিত ভাবেই ঋতুস্রাব হইতেছে। তখন প্রাতে অশোক ঘৃত, বৈকালে প্রদরান্তক রস ও রাত্রে অশোকারিষ্ট ব্যবস্থা করিলাম। ছয় মাস পরে শুনিলাম রোগিণী সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে। অদ্যাবধি তাঁহার অন্য কোন অসুখ হয় নাই।

কবিরাজ—শ্রীমৈত্র।

"চিকিৎসকের দুঃখ" প্রবন্ধের প্রতিবাদ।

—:০:—

শ্রদ্ধাস্পদ—

শ্রীযুক্ত "আয়ুর্ব্বেদ" সম্পাদক

মহাশয়গণ সমীপেষু—

মহাশয়গণ, গত বৈশাখমাসের "আয়ুর্ব্বেদে" "চিকিৎসকের দুঃখ"—শীর্ষক প্রবন্ধটি যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া দুঃখিত হইয়াছি। বুঝিবার ভুলে কেহ হয়তো ঐরূপ প্রবন্ধ লিখিতে পারেন, কিন্তু কেমন করিয়া আপনারা "আয়ুর্ব্বেদে"র মত উচ্চ শ্রেণীর চিকিৎসা বিষয়ক পত্রে উহা স্থান দান করিলেন বুঝিতে পারিলাম না। আমার দুঃখের কারণ ইহাই,—নতুবা ওরূপ প্রবন্ধ কেহ পড়িয়া শুনাইলে, উহাকে প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিতাম।

লেখক বলিয়াছেন,—"চিকিৎসা অতি মহৎ ও পুণ্য কর্ম্ম,—ইহা অনেকেরই বিশ্বাস, অন্ততঃ চিকিৎসকগণকে সমাজএই চাটুবাক্যেই অভিনন্দিত করে। কিন্তু চিকিৎসা-ব্যবসা কি সত্যই মহৎ?"

লেখকের এই স্থানেই তো মহা গলদ দেখিতেছি। "চিকিৎসা যে অতি মহৎ ও পুণ্য জনক কর্ম্ম—,—তাহা অনেকের বিশ্বাস" হইলেও লেখক তাহা বিশ্বাস করেন না। এই জন্য সমাজের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া সমাজকে চাটুকার বলিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। বলি, সমাজ এই চাটুবৃত্তি করিবে কিসের জন্য? লেখক তো একটু পরেই বলিয়াছেন,—"অর্থের বিনিময়ে চিকিৎসা করা হয়।" যদি অর্থ লইয়াই চিকিৎসা করা হইল, তবে সমাজ—চিকিৎসকের নিকট কোন্ বাধ্যতা গুণে তাহার চাটুবৃত্তি অবলম্বন করিবে? সমাজ চিকিৎসা কার্য্যকে মহৎ ও পুণ্যকর্ম্ম কেন বলেন, লেখক তাহা খুলিয়া বলিতে পারেন নাই, আমরা বলি শুনুন—শাস্ত্রে আছে,—

"কপিলা কোটী দানাদ্ধি যৎফলং পরিকীর্ত্তিতম্
ফলং তৎ কোটীগুণী তমেকাতুর-চিকিৎসয়া।"

অর্থাৎ কোটী কপিলা দান করিলে যে ফল লাভ হয়, একটীমাত্র রোগীকে আরোগ্য

করিলে তাহারও কোটীগুণ ফললাভ হইয়া থাকে। চিকিৎসক এবম্বিধ পুণ্যজনক কার্য্যে ব্রতী বলিয়াই তিনি সমাজের চক্ষে প্রকৃতই মহান এবং পুণ্যবান। লেখক কি এ কথা অবগত নহেন?

মহাপুরুষ চাণক্য চিকিৎসকের গুণব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—

"আয়ুর্ব্বেদ কৃতাভ্যাসঃ সর্ব্বেষাং প্রিয় দর্শনম্
আর্য্যশীল গুণোপেত এষ বৈদ্যো বিধীয়তে॥"

অর্থ লইয়া চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন সম্বন্ধে লেখক যে উহা অপকর্ম্ম বলিয়াছেন—ইহাও অতি বিস্ময়ের কথা। তিনি তো নিজেই বলিয়াছেন,—"অর্থগ্রহণ না করিলে চিকিৎসকের জীবিকা নির্ব্বাহ হয় না।" এ স্থলে একই লেখকের উভয় কথার সামঞ্জস্য কিরূপ রহিয়াছে—তদৃষ্টে হাস্য সম্বরণ করা যায় না।

অর্থ গ্রহণ না করিয়া চিকিৎসক করিবেন কি? পেটের দায়ে তাঁহাকে অর্থ গ্রহণ করিতে হয়। শাস্ত্রও তো সকলের নিকট অর্থ লইতে নিষেধ করেন নাই। শাস্ত্রকার তো বলিয়া গিয়াছেন,—জীবিকানির্ব্বাহার্থ রাজা এবং ধনবান ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে অর্থ অবশ্য গ্রহণীয়। যথা—

"ঈশ্বরাণাং বসুমতাং লিপ্সেতার্থন্তু বৃত্তয়ে।"

লেখক এক স্থলে বলিয়াছেন,—"মানুষের প্রকৃতিই রোগ প্রতিষেধক। চিকিৎসক সেই প্রকৃতির সহায়তা করিতে পারেন মাত্র। সেই প্রকৃতির সম্পূর্ণ স্বরূপ কোন চিকিৎসক জানিতে পারিয়াছেন?"

হা অদৃষ্ট, লেখক আয়ুর্ব্বেদের শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আয়ুর্ব্বেদের মূলমন্ত্রটুকুও যে ভুলিয়া গিয়াছেন, তাহা জানিতাম না! আয়ুর্ব্বেদের মূল মন্ত্র—

"ব্যাধেস্তত্ত্বঃ পরিজ্ঞানং বেদনায়াশ্চ নিগ্রহম্।
এতৎ বৈদস্য বৈদ্যত্বং নবৈদ্যঃ প্রভুরায়ুষঃ॥"

অর্থাৎ ব্যাধির তত্ত্ব অবগত হইয়া উপদ্রবের দূর করাই চিকিৎসকের কার্য্য; বৈদ্য কখন আয়ুর প্রভু নহেন। এই কথাতেই তো সব কথা বলা হইয়াছে। তবে লেখক মহাশয় আবল-তাবল বকিতে বসিয়াছেন কেন?

লেখক বৈদ্যের জন্ম বৃত্তান্তের সহিত তাহার যে বৃত্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা একেবারেই অসঙ্গত। কোন শাস্ত্রে—কোন পুরাণে—ব্যবসায় স্থির করিবার জন্য বৈদ্যের জন্ম রহস্য লিপিবদ্ধ হয় নাই। নিজের জাতিগত ব্যবসায়ের কথা বলিতে গিয়া তাহার জন্ম-রহস্য আনিয়া—তাহাকে যে এতাদৃশ নীচতার আসনে স্থান দান করিতে কুণ্ঠিত নহে, তাহার কল্পনা,—তাহার লেখনী—তাহার প্রবন্ধ—বৈদ্য সমাজে যে ধিক্কৃত হইবার উপযুক্ত, সে বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। আমাদিগকেও ধিক যে,—সে লেখার আবার আমরা প্রতিবাদ করিতেছি।

লেখক বলিয়াছেন,—"আমাদের দেশে কি পাশ্চাত্য দেশে—কোন দেশের ইতিহাসে চিকিৎসকের নাম উল্লিখিত হয় নাই।" বাহবা বুদ্ধি! এত বুদ্ধি না হইলে আর কেহ নিজের দুঃখ সমাজে প্রকাশ করিতে বসে! পাশ্চাত্য সমাজের কথায় কাজ নাই, আমাদের সমাজের কথা বলি।—চিকিৎসক-অশ্বিনী কুমারদ্বয় ছিন্নশিরঃ-ব্রহ্মার শিরোযোজনা করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা যজ্ঞভাগী হইয়াছিলেন। রামায়ণ জানা আছে তো? ভিন্ন জাতি হইলেও সুষেণ যে বৈদ্য বা চিকিৎসক ছিলেন তাহাতো অস্বীকার করিবার জো নাই। সে সুষেণের নাম রামায়ণে কীর্ত্তিত কেন? এই বৃত্তির জন্য।

সকল কথার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিবাদ করিলে প্রবন্ধ বড়িয়া যাইবে। তাই আর বেশী বলিব না। সংক্ষেপে আর দু' একটা কথা কহিয়া লই।

লেখক বলিয়াছেন,—"চিকিৎসা বৃত্তির দ্বারা সংসারে বন্ধুতা লাভ হয় না।" আত্ম-মতের সমর্থনের জন্য কেহ যে শাস্ত্রের সকল কথাও উপেক্ষা করিতে পারে, ইহা জানিতাম না। চিকিৎসা বৃত্তির ফলে—

ক্বচিদ্বর্থঃ ক্বচিন্মৈত্রী ক্বচিদ্ধর্ম্মঃ ক্বচিদযশঃ।
কর্ম্মাভ্যাসঃ ক্বচিচ্চাপি চিকিৎসা নাস্তি নিষ্ফলা।

অর্থাৎ চিকিৎসাবৃত্তির ফলে কোন স্থানে অর্থ লাভ, কোন স্থানে মিত্রতালাভ, কোন স্থানে ধর্ম্মলাভ, কোন স্থানে যশঃলাভ এবং যেখানে কিছুই লাভ হয় না, সেখানে কর্ম্মাভ্যাস বা Practical knowledge লাভ হয়—অতএব এ বৃত্তি নিষ্ফল নহে,—এ কথা যে লেখক ভুলিয়া গেলেন—ইহা খুবই আশ্চর্য্যের বিষয়।

লেখক একস্থলে বলিয়াছেন,—"চিকিৎসক অপাংক্তেয় বলিয়া নিন্দিত, তাহার অন্ন অভক্ষ্য বলিয়া কথিত।" আমরা পরাশর সংহিতার মত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি, চিকিৎসক অপাংক্তেয় নহেন। যথা—

বৈশ্যকন্যাসমুৎপন্নম্ ব্রাহ্মণেনতু সংস্কৃতম্
অম্বষ্ঠ জায়তে নামাঃ ব্রাহ্মণেন সহ ভোজনৈঃ॥"

এ অবস্থায় বৈদ্য বা চিকিৎসককে অপাংক্তেয় বলিব কেমন করিয়া? লেখক বলিয়াছেন—"রামকৃষ্ণ পরমহংস চিকিৎসকের অন্নগ্রহণ করিতেন না।" জানিনা রামকৃষ্ণ পরমহংস কি করিতেন, কিন্তু সাক্ষাৎ শঙ্করের অবতার শঙ্করাচার্য্য চিকিৎসককে সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করিতেন, তাহারই প্রমাণ স্বরূপ তিনি বলিয়া গিয়াছেন,—

"বৈদ্যঃ নারায়ণঃ হরিঃ।"

লেখক সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ কি না জানিনা, কিন্তু সকল কথা তাঁহার মনে নাই—এবং সকল কথা না জানিয়া—না বুঝিয়া এরূপ প্রবন্ধের অবতারণা যে করিতে নাই—ইহা জোর করিয়া বলা যাইতে পারে।

শ্রীবিনোদবিহারি রায় গুপ্ত ধন্বন্তরি।

ক্ষয়রোগ।

যক্ষ্মা পৃথিবী ব্যাপী এবং বহু প্রাচীন রোগ। পৌরাণিক কাহিনীতে চন্দ্রের যক্ষ্মারোগ হইয়াছিল এইরূপ কথিত হইয়াছে। তারকা-রাজ—চন্দ্রের ক্ষয়রোগ 'রাজ'-যক্ষ্মা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। রসাদি ধাতুর ক্ষয় করে বলিয়া ইহার নাম ক্ষয় এবং শরীরকে শুষ্ক করে বলিয়া ইহার নাম শোষ।

ক্ষয়রোগ যে সংক্রামক—আয়ুর্ব্বেদে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। যথা,—

প্রসঙ্গাদ্ গাত্রসংস্পর্শাৎ নিঃশ্বাসাৎ
সহভোজনাৎ।
এক শয্যাসনাচ্চৈব বস্ত্রমাল্যানুলেপনাৎ॥
কুষ্ঠং জ্বরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এবচ।
ঔপসর্গিক রোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরম্॥

অর্থাৎ একত্র অবস্থান, গাত্রসংস্পর্শ, নিঃশ্বাস লাগা, একত্র ভোজন, এক শয্যা বা আসনে শয়ন বা উপবেশন, এক বস্ত্র, মাল্য বা অনুলেপন, চন্দনাদি ব্যবহার প্রভৃতি কারণে কুষ্ঠ, জ্বর, শোষ, নেত্রাভিষ্যন্দ (চোখ উঠা) এবং উপসর্গিক রোগ সকল এক ব্যক্তির শরীর হইতে অন্য ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে।

ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, উপরি উক্ত কারণে রোগ বীজ একের শরীর হইতে অন্যের শরীরে প্রবেশ করে। পাশ্চাত্য চিকিৎসক গণের মতেও এক প্রকার জীবাণু একের শরীর হইতে অন্যের শরীরে প্রবেশ করিয়া ক্ষয় রোগ উৎপন্ন করে।

কিন্তু রোগবীজ শরীরে প্রবেশ করিলেই যদি রোগ উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে এতদিন পৃথিবী হইতে মানব জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইত।

মানব শরীরে একটী পালিনী শক্তি আছে। সেই শক্তি শরীরের অনিষ্টকারক যাবতীয় কারণের ধ্বংস সাধন করিয়া শরীরকে রক্ষা করিয়া থাকে। যতদিন সেই শক্তি প্রবল থাকে, ততদিন কোন রোগই শরীরকে আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিতে পারেনা। বিবিধ অত্যাচারের ফলে দেহস্থ ঐ পালিনী শক্তি যখন অত্যন্ত দুর্ব্বলা হইয়া পড়ে, তখন সেই দুর্ব্বলা শক্তির বাধা অতিক্রম করিয়া দেহ প্রবিষ্ট রোগবীজ রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

শাস্ত্রে যক্ষ্মারোগের চারিটি কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা সাহস, বেগরোধ, ক্ষয় এবং বিষমাশন। প্রত্যেকের বিষয় পৃথক ভাবে বলা যাইতেছে।

সাহস—নিজের শরীরে যেরূপ বল, তাহার অতিরিক্ত বল-প্রয়োগ-সাধ্য কোন কার্য্য করাকে সাহস বলে। গুরুভার বহন, অতিরিক্ত বলবান ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ (কুস্তি করা), দ্রুতগামী অশ্বকে, বৃষকে বলপূর্ব্বক ধারণ করা, সন্তরণ করিয়া মহানদী পার হওয়া—প্রভৃতি সাহস পদ কার্য্য।

এইরূপ সাহসের জন্য বক্ষঃস্থলে ক্ষত হয় এবং বায়ু সেই ক্ষতকে আশ্রয় করে। অনন্তর সেই বায়ু বক্ষঃস্থ শ্লেষ্মার সহিত উর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যক দিকে প্রসরণ করে।

দোষ সকল মস্তকে আশ্রয় করিয়া শিরঃ শূল, গলদেশ আশ্রয় করিয়া কণ্ঠোদ্ধংস (গলা খুস খুসি), কাস, স্বরভঙ্গ ও অরুচি, পার্শ্বদেশ আশ্রয় করিয়া মলভেদ, সন্ধি আশ্রয় করিয়া জৃম্ভণ (হাই-উঠা) ও জ্বর, যক্ষা আশ্রয় করিয়া বক্ষোবেদনা উৎপন্ন করে। বক্ষে ক্ষত হওয়ায় কাসের সহিত কফ মিশ্রিত রক্ত নির্গত হয় এবং কাসের সময় বক্ষে শূলনিঘাতবৎ বেদনা অনুভূত হয়। শাস্ত্রে সাহসজ যক্ষ্মারোগের এই একাদশ প্রকার উপদ্রবের বিষয় লিখিত হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বত্র সবগুলিই যে প্রকাশ পায় তাহা নহে।

বেগধারণ—লজ্জা, ঘৃণা বা ভয় বশতঃ অধোবায়ু, মূত্র ও পুরীষের উপস্থিত বেগ ধারণ করিলে বায়ু কুপিত হইয়া এবং অন্যান্য দোষের সহিত মিলিত হইয়া উর্দ্ধ তির্য্যক ও অধোদেশে প্রসারিত ক্ষয়রোগ উৎপন্ন করে।

প্রতিশ্যায়, কাস, স্বরভেদ, অরুচি, পার্শ্বশূল, শিরঃশূল, জ্বর, অঙ্গবেদনা, গা আড়া-মোড়া করা, বার বার বমি হওয়া এবং মলভেদ—এই সকল লক্ষণ—এইরোগে প্রকাশ পায়।

ক্ষয়-যক্ষ্মা—অতিমাত্র শোক, চিন্তা, ঈর্ষা, উৎকণ্ঠা, ভয়, ক্রোধ, প্রভৃতি কারণে, কৃশ ব্যক্তির উপবাস এবং রুক্ষ অন্ন পান-সেবন হেতু, দুর্ব্বল প্রকৃতির অনাহার বা অল্পাহার হেতু, এবং অতিরিক্ত স্ত্রী সহবাস বশতঃ শরীর ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং তজ্জন্য কুপিত বায়ু অন্যান্য দোষের সহিত মিলিত হইয়া ক্ষয় রোগ উৎপন্ন করে।

ক্ষয়জ যক্ষ্মারোগে প্রতিশ্যায়, জ্বর, কাস, অঙ্গমর্দ্দ, শিরোবেদনা, শ্বাস, মলভেদ, অরুচি, পার্শ্বশূল, স্বরভঙ্গ, এবং স্কন্ধ দেশে বেদনা—এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

বিষমাশন—কোন সময়ে অল্প, কোন সময়ে অধিক, কখন বিকালে, কখন দু'পরে, কখন সকালে আহার করাকে বিষমাশন বলে। এই বিষমাশন ক্ষয় রোগের হেতু। বাভট বলিয়াছেন "অন্ন পান বিধি ত্যাগ" অর্থাৎ আহার ও পানের নিয়ম পরিত্যাগ যক্ষ্মারোগের হেতু। সুতরাং পানাহার সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার অনিয়ম হইতেই যক্ষ্মারোগ উৎপন্ন হইতে পারে। চরকে কথিত হইয়াছে যে, বিষমাহার বশতঃ ত্রিদোষ প্রকুপিত হইয়া শরীরস্থ স্রোতঃ সকলের মুখ রুদ্ধ করে। স্রোতোমুখ রুদ্ধ হওয়ায় ভুক্ত দ্রব্য সম্যক রূপে শরীর পোষণ করিতে পারে না। পরন্তু অধিকাংশ মল-মূত্র রূপে পরিণত হয়। এইজন্য পোষণাভাবে দেহ ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকে।

বিষমাশন জনিত যক্ষ্মারোগে প্রতিশ্যায় মুখ দিয়া থুথু উঠা, কাস, বমি, অরুচি, জ্বর, স্কন্ধ দেশে বেদনা, রক্তবমন, পার্শ্বদেশে এবং মস্তকে শূল-নিঘাৎ-বৎ বেদনা এবং স্বরভঙ্গ হয়। এই চারিটী কারণ বশতঃ যক্ষ্মারোগ উৎপন্ন হয়। এতদ্ভিন্ন শাস্ত্রে কথিত হইয়াছেঃ—

প্রতিশ্যায়াদথো কাসঃ কাসাৎ সংজায়তে ক্ষয়ঃ।

অর্থাৎ প্রতিশ্যায় (সর্দ্দি লাগা—নাক মুখ দিয়া জলপড়া) রোগ উপস্থিত হইলে কাস এবং কাসরোগ উপেক্ষিত হইলে ক্ষয়রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ইহার সার্থকতা অনেক সময় প্রত্যক্ষ করা যায়, সামান্য কারণ হইতে (যেমন এক দিন জলে ভেজা বা অন্য কারণে ঠাণ্ডা লাগা)—পরিণামে উৎকট যক্ষ্মারোগ উৎপন্ন হয়। ইহার কারণ রোগকে উপেক্ষা করা। ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি হইল, তাহা গ্রাহ্য না করিয়া সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় স্নানাহার চলিতে লাগিল, হয়ত কিছু অত্যাচারও হইল, ফলে কাস রোগ জন্মিল। সেই কাস রোগও উপেক্ষিত হইল, ক্রমে ফুস্‌ফুস্ বিকৃত হইল, শরীরের রোগ প্রতিষেধক শক্তি কমিয়া গেল তখন কোনরূপে যক্ষ্মারোগের বীজ শরীরে প্রবেশ করিলে আর নিস্তার নাই। চাষ করা সার দেওয়া জমিতে উক্ত বীজ যেমন সহজে বৃক্ষরূপে বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, সেইরূপ রুগ্ন দেহে রোগ-বীজ সহজেই যক্ষ্মা রোগ উৎপন্ন করিয়া থাকে। এই জন্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছেঃ—

"রোগ জন্মিবামাত্র প্রতিকার করা উচিত সামান্য রোগকেও উপেক্ষা করিবে না। কারণ অগ্নি, শস্ত্র ও বিষের ন্যায় সামান্য রোগও মহান অনিষ্ট উৎপাদন করিতে পারে।"

সর্ব্বপ্রকার কাস রোগই উপেক্ষিত হইলে ভবিষ্যতে যক্ষ্মারোগ উৎপন্ন হইতে পারে। কাস নিদানে কথিত হইয়াছে, "সর্ব্ব-প্রকার কাস (বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, ক্ষতজ এবং ক্ষয়জ পাঁচ প্রকার) উপেক্ষিত হইলে ক্ষয়-রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রে কথিত হইয়াছেঃ—"অজীর্ণ অন্ন ঘোর বিষ। এই অজীর্ণ অন্ন

কফের সহিত মিশ্রিত হইয়া যক্ষ্মা ও পীনসাদি রোগ সকল উৎপন্ন করিয়া থাকে।"

পূর্ব্বে সাহসাদি ক্ষয়রোগের চারিপ্রকার নিদান বলিয়া কথিত হইয়াছে, এই দুইটীও তাহার অন্তর্ভুক্ত। নচেৎ পূর্ব্বোক্ত কারণ চতুষ্টয়ের অব্যাপ্তি দোষ হইয়া পড়ে। কাস রোগে শরীর ক্ষয় প্রাপ্ত হয় বলিয়া কাস হইতে ক্ষয়রোগ জন্মে, তাহাও ক্ষয় বা যক্ষ্মা রোগের অন্তর্ভুক্ত।

অজীর্ণ হইতে যে ক্ষয় রোগ জন্মে, তাহাও এইরূপ বুঝিতে হইবে। কারণ অজীর্ণ অন্ন সম্যক জীর্ণ হয় না বলিয়া ধাতু সমূহের পোষণ করিতে পারে না। পোষণাভাবে ধাতু সমূহ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে। সুতরাং ইহাকে ক্ষয়জ যক্ষ্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

ক্ষয় দুই প্রকারে হইয়া থাকে; যথা অনুলোম ক্ষয় এবং বিলোম ক্ষয়। রস ধাতুর ক্ষয় ঘটিলে পরবর্ত্তী রক্তাদি ধাতুর ক্রমশঃ ক্ষয় হয়। ইহাই অনুলোম ক্ষয়। আবার শুক্র ধাতুর ক্ষয় ঘটিলে পূর্ব্ববর্ত্তী মজ্জাদি ধাতুর ক্রমশঃ ক্ষয় হয়। ইহাকে বিলোম ক্ষয় বলে। অতিরিক্ত স্ত্রীসহবাস, শোক প্রভৃতি কারণে শরীর শুষ্ক হইতে থাকিলেই তাহাকে ক্ষয়রোগ বলা যায় না। যতক্ষণ ক্ষয়রোগের বীজ শরীরে প্রবেশ না করে, ততক্ষণ ক্ষয়রোগ উৎপন্ন হয় না। এই পার্থক্য বুঝাইবার জন্য শাস্ত্রকার পৃথক শোষ রোগের নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"অতিরিক্ত স্ত্রীসহবাস, শোক, বার্দ্ধক্য, ব্যায়াম, পথ-পর্য্যটন, উপবাস—এই সকল কারণে এবং ব্রণ (ক্ষত) ও উরঃক্ষত (অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করিয়া কার্য্য করার জন্য বক্ষের অভ্যন্তর ভাগে ক্ষত হওয়া) হইতে শোষরোগ উৎপন্ন হয়" কোন কোন চিকিৎসক এইরূপ বলিয়া থাকেন।

বুদ্ধিমান পাঠক, লক্ষ্য করিয়া দেখুন যে, অতিরিক্ত স্ত্রী সহবাস, শোক, অতিরিক্ত বল প্রয়োগ পূর্ব্বক কার্য্য করার জন্য বক্ষে ক্ষত হওয়া প্রভৃতি কারণে ক্ষয়রোগ উৎপন্ন হয় তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আবার ঐ সকল কারণে রোগ উপস্থিত হয়—নির্দ্দেশ করা হইল, এই পার্থক্যের মধ্যে কি আছে? আছে "সংক্রামন্তি নরান্নরং"—রোগবীজ সংক্রমণ হওয়া চাই। ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে, আধুনিক যক্ষ্মারোগের জীবাণু তত্ত্ব শাস্ত্রকার দিগের সুবিদিত ছিল।

কেহ বলিতে পারেন যে, জীবাণুতত্ত্ব যদি সুবিদিতই ছিল—তবে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই কেন? তাঁহাদিগের বুঝা উচিত যে, বর্ত্তমানে আমরা কেবল আয়ুর্ব্বেদের কঙ্কালটুকু মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। আয়ুর্ব্বেদের রক্ত-মাংস-মেদে কি ছিল না ছিল—তাহা কি করিয়া বলিব? জানিনা আবার কতদিনে আয়ুর্ব্বেদের কঙ্কালে রক্ত-মাংস-মেদ সংযুক্ত হইবে।

(ক্রমশঃ)

BENGAL LIBRARY 1918

মুষ্টিযোগ ও টোট্‌কা

ক্রিমিতে ব্যবস্থা।—(১) পালিধা মাদারের পাতার রস প্রাতঃকালে পান করাও, শিশুদিগের ক্রিমি সারিয়া যাইবে। ৫ বৎসরের শিশুর পক্ষে মাত্রা সিকি ঝিনুক। উহার কম বয়স্কের এক ঝিনুকের ৮ অংশ। (২) দাড়িমের শিকড়ের ক্বাথ পান করাইলে ক্রিমি মরিয়া যায়। উহার মাত্রাও পূর্ব্ববৎ। (৩) পলাশ-বীজ, ইন্দ্রযব, বিড়ঙ্গ, নিমছাল ও চিরাতা চূর্ণ প্রত্যেক দ্রব্য দুই রতি এবং গুড় একআনা, একত্র সেবন করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়। (৪) পলাশবীজ আধআনা ও যমানী একআনা একত্র করিয়া কয়েক দিন সেবন করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়। (৫) ঘেঁটুপাতার রস ও আনারসের কচি পাতার রস এক একটি সিকি ঝিনুক লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশাইয়া শিশু-দিগকে পান করাও,—ক্রিমি নষ্ট হইবে।

হৃদ্‌শূল ও হৃদ্‌রোগে।—(১) দুই-তোলা শুঁঠ, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ-পোয়া থাকিতে নামাইয়া পান কর—হৃদ্‌শূল ও হৃদ্‌রোগ প্রশমিত হইবে। (২) অর্জ্জুন ছালের গুঁড়া দুইআনা লইয়া একছটাক গরম দুগ্ধের সহিত পান কর—হৃদয়ের যন্ত্রণার আশু নিবৃত্তি হইবে।

মূত্রকৃচ্ছ্রে সুব্যবস্থা।—(১) কুশ মূল, কেশে মূল, শরমূল, খাগড়ামূল ও ইক্ষু মূল—প্রত্যেক দ্রব্য ।৵১০ সাড়ে ছয় আনা ওজনে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া পান করিলে সহজে প্রস্রাব হইয়া মূত্রকৃচ্ছ্রের যন্ত্রণা নিবৃত্তি হয়। (২) গোক্ষুর বীজ দুইতোলা, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া তাহাতে এক আনা পরিমিত সোরা ফেলিয়া মিশাইয়া লইয়া পান কর,—মূত্রকৃচ্ছ্রের যন্ত্রণার সদ্যঃ শান্তি হইবে। (৩) শ্বেত বেড়েলা দুইতোলা, অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া লইয়া পান কর, মূত্রকৃচ্ছ্রের শান্তি হইবে।

প্রমেহ চিকিৎসা।—(১) দূর্ব্বা, কেশুর, নাটাকরঞ্জার ছাল, টোকাপানা, কৈবর্ত্ত মুতা ও শেওলা—প্রত্যেক দ্রব্য ।/১০ সাড়ে পাঁচ আনা ওজনে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া পান কর, শুক্রমেহ প্রশমিত হইবে। (২) হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, (প্রত্যেক দ্রব্যের আঁটি বাদ) সোঁদাল ফলের শাঁস ও কিস্‌মিস্—এই পাঁচটী দ্রব্যের প্রত্যেকটি ।৵১০ সাড়ে ছয় আনা ওজনে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া একটু মধু মিশাইয়া পান কর—ফেনা যুক্ত মেহের সদ্যঃ শান্তি হইবে। (৩) দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, হরীতকী, আমলা, বহেড়া (এই তিনটি দ্রব্যের আঁটি বাদ) ও চিতামূল প্রত্যেক দ্রব্য ।/১০ সাড়ে পাঁচ আনা ওজনে লইয়া আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া কয়েক দিন পান কর,—প্রমেহের শান্তি হইবে।

বহুমূত্রে যোগ।—(১) কলার এঁটের রস প্রাতে দুই তোলা ও বৈকালে ২ তোলা লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন কর, উপকার হইবে। (২) পাকা কলা ২টা, আমলকীর রস ২ তোলা, মধু ।৵১০ সাড়ে ছয় আনা, চিনি ।৵১০ সাড়ে ছয় আনা ও দুগ্ধ এক পোয়া একত্র মিশাইয়া কয়েক দিন সেবন কর,—বহুমূত্রে উপকার হইবে।

শ্রীঅতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিভূষণ।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

দান।—মাননীয় জজ শ্রীযুক্ত এ. চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী মিসেস চৌধুরী মহোদয়া সংপ্রতি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় পরিদর্শনে তৃপ্তি লাভ করিয়া বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে ১০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

রোগীর হিসাব।—বাঙ্গালা দেশে প্রত্যেক ১৫ জনের মধ্যে ৬ জনের চক্ষুরোগ; প্রত্যেক ৫ জনের মধ্যে ১ জনের দন্তরোগ, প্রত্যেক ৬ জনের মধ্যে ২ জনের আল্‌জীব বৃদ্ধি বা টন্‌সিল রোগ এবং প্রত্যেক ৭ জনের মধ্যে ১ জনের করিয়া অন্ত্র ফুলা রোগ।

মাদক দ্রব্য।—সনগ্রবঙ্গে গত ১৯১৫ খৃঃ অব্দে মদ্ বিক্রয় হইয়াছিল—৩১৩৯৫৯০ সের, গাঁজা বিক্রয় হইয়াছিল—৯২০১৬ সের; অহিফেন বিক্রয় হইয়াছিল—৫২৮২৩ সের। ১৯১৬ খৃঃ অব্দে মদ ৩০১০০০০ সের, গাঁজা ৭৩২১৮ সের এবং অহিফেন ৪৩৪৭৯ সের। ১৯১৭ খৃঃ অব্দে মদ ৩১৮৫০০০ সের, গাঁজা ৭৫১৯৩ সের এবং অহিফেন ৩৮১১৮ সের। হিসাবে বুঝা যায়—বাঙ্গালা দেশ নেশায় মজগুল্ হইয়া পড়িয়াছে। গাঁজা ও আফিংখোর অপেক্ষা মাতালের সংখ্যাই হিসাবে অধিক।

মত্ততায় দণ্ড।—বাঙ্গালা দেশে মাতলামির জন্য ১৯১৪-১৫ খৃঃ অব্দে দণ্ড পাইয়াছিল ৯২৮৭ জন। ১৯১৫-১৬ খৃঃ অব্দে ঐরূপ দণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা ৯৩৭৮ জন এবং ১৯১৬-১৭ খৃঃ অব্দে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি ৯৮৬৫ জন। ইহার মধ্যে কেবল কলিকাতায় ১৯১৪-১৫ খৃঃ অব্দে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি ৮২১৬ জন; ১৯১৫-১৬ খৃঃ অব্দে ৬৭৬৩ জন এবং ১৯১৬-১৭ খৃঃ অব্দে ৬৯৬৫ জন। কলিকাতা বাঙ্গালার সকল স্থানের সেরা, কাজেই কলিকাতায় সব বিষয়েরই বাড়াবাড়ি।

শোকসভা।—৺দুর্গাপ্রসাদ সেন কবিরাজ মহাশয়ের জন্য গত ৮ই বৈশাখ কলিকাতা ইন্‌ভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে এক বিরাট শোকসভা হইয়াছিল। অনেকেই বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই বৃদ্ধ বৈদ্যের সম্বর্দ্ধনার জন্য একটি স্মৃতি সংরক্ষণ করা হইবে সাব্যস্ত হইয়াছে।

কর্‌পোরেসনের সাহায্য।—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি এ বৎসর আড়াই হাজার টাকা দান করিয়াছেন। আমরা এজন্য তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ।

IMPERIAL LIBRARY

182.Ab.916.11

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

২য় বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৫—আষাঢ়। | ১০ম সংখ্যা।

স্বাস্থ্যরক্ষায় সমুদ্রতীর।

—— :*: ——

তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া মুক্তাজাল ছড়াইতে ছড়াইতে গভীরগর্জ্জনে বেলাভূমির দিকে পুনঃ পুনঃ সমুদ্র বেগে ছুটিয়া আসিতেছে, আবার মাথা আছড়াইয়া তীরস্থ যা' কিছু লইয়া মুহূর্ত্তে সরিয়া যাইতেছে, আবার তরঙ্গ তুলিতেছে, মুক্তাবৃষ্টি করিতেছে, তীরের দিকে ছুটিতেছে, আবার সরিয়া যাইতেছে, এ আসা-যাওয়ার বিরাম নাই, এ লীলা-খেলার অন্ত নাই; অনন্ত অগাধ অকূল অসীম সমুদ্র আপনার লীলায়, আপনার খেলায় আপনিই বিহ্বল, আপনিই উন্মত্ত, আপনিই মোহিত! লহরে লহরে হীরা, চুণ্নি, পান্নার গড় বাঁধিতেছে, পলকে ভাঙ্গিয়া দিতেছে, বুক ফুলাইয়া আপনার মনে আপনি হাসিতেছে, শতবজ্রধ্বনিকে ছাপাইয়া গভীর-গর্জ্জনে নিজের বল বিক্রম বিশ্ববাসীকে বুঝাইয়া দিতেছে। চক্ষুঃ পলক তুলিয়া নিয়ত এই দৃশ্য দেখিতে চায়, গড়ের মাঠে ঘোড়ার মত সমুদ্রের বুকে ছুটিয়া যায়, আকাশ নুইয়া পড়িয়া সমুদ্রের বুকে আবরণের সৃষ্টি করিয়াছে; সেইখানে বাধা পাইয়া আবার ফিরিয়া আসে। সমুদ্রের বুকে পলকে পলকে যে কত রঙের পরিবর্ত্তন, কত রঙের একত্র সমাবেশ হইতেছে, কত রঙের কতরকমের ছোট বড় কত যে উজ্জ্বল চকচকে—ঝকঝকে ফুল ফুটিতেছে, তাহা দেখিয়া চোখ ফিরিতে চায়না, দেখিতে দেখিতে পরিশ্রান্ত হয়না, অবসাদ পায়না, আনন্দে বিস্ফারিত হইয়া থাকে।

বৃদ্ধযুবকের চক্ষুও বালকের চক্ষুর মত জিজ্ঞাসু হইয়া পড়ে, বিস্ময়ে সাগরে ভাসিয়া বেড়ায়। দৃষ্টিশক্তি তাহার পুনঃ পুনঃ নূতন নূতন খাদ্য পাইয়া বাড়িয়া উঠে, সবল হয়। সমুদ্রের বক্ষঃস্থল অসীম, কেবল ধূধূ করিতেছে, বায়ু কোনস্থলেই বাধা পায় না, সমুদ্রের বুকে অসীম নির্ম্মল আকাশ পাইয়া কেবল খেলিয়া

বেড়াইতেছে, কাচস্বচ্ছ লবণাম্বুর তরঙ্গে শত শত শ্বেতপদ্ম ফুটাইতেছে, তরঙ্গে তরঙ্গে সন্তরণ করিয়া আকাশ সাগরে ভাসিয়া পুনঃপুন আসিয়া মানবমানবীর সর্ব্বাঙ্গ আঁকড়াইয়া পুনঃপুন আলিঙ্গন করিতেছে। বায়ুর সেই অনুষ্মাশীত স্পর্শে সর্ব্বাঙ্গে এক নবভাব আসিতেছে, সন্তাপ ও জড়তা দূরে সরিয়া পড়িতেছে। বায়ু-হিল্লোলে ভাসিয়া মানবের কর্ম্মশক্তি চতুর্গুণ বাড়িয়া উঠিতেছে। হস্ত, পদ, সবল হইতেছে, মনে স্ফূর্ত্তি ও উৎসাহ জন্মিতেছে। সমুদ্র গর্জ্জনের বিরাম নাই, শতশত ঝড়, শতশত সাইক্লোন—সমুদ্রবক্ষে ঘনীভূত হইয়া অবিশ্রাম শব্দ উঠাইতেছে, তরঙ্গের উপরে সবেগে সবলে তরঙ্গ পড়িয়া শতকামানের ঘোরগর্জ্জনকে ছাপাইয়া নবীন মেঘের শতবজ্রপাতী ঘনগভীরধ্বনিকে নীচু নীচু করিয়া অনবরত গুড়ুম গুড়ুম শব্দ তুলিতেছে। এই শব্দরাশির ভিতরে পড়িয়া কর্ণের বিশ্রাম নাই, শব্দেও কঠোরতা নাই, জল ও বায়ুর মিলনে সেই গভীর ঘোরগর্জ্জনের মধ্যেও কোমলতা আসিয়াছে।

গাম্ভীর্য্য ভীষণতা ও কোমলতার একত্র মিলন ঘটিয়াছে। এই গভীর ঘোর গর্জ্জন গ্রহণে কর্ণ সমর্থ। কর্ণ প্রস্তুত হইয়া এই সব গ্রহণ করিতেছে, করিতে করিতে তাহার সামর্থ্য বাড়িতেছে, শক্তিবর্দ্ধিত হইতেছে। স্নানার্থী সমুদ্রজলে আবক্ষঃ মগ্ন করিয়া সমুদ্রের দিকে পৃষ্ঠ রাখিয়া দাঁড়াইয়াছে; সমুদ্র পর্ব্বত-প্রমাণ তরঙ্গ তুলিয়া বেগে আসিয়া তাহার গায়ে ছুটিয়া পড়িতেছে, সর্ব্বাঙ্গ আপ্লাবিত করিয়া মাথার উপর দিয়া সেই পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গ চলিয়া যাইতেছে, আবার ফিরিবার সময়েও সবলে নাকে, মুখে, লবণাম্বুর ঝটকা লাগাইয়া স্থানভ্রষ্ট করিয়া আছড়াইয়া ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছে। এইভাবে সমুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে স্নানার্থীর ব্যায়াম হয়, সেই ব্যায়ামে সর্ব্বশরীর দৃঢ় হয়, শরীরে বলের প্রতিষ্ঠা হয়, লবণাম্বুর ঝটকায় লোমকূপগুলি পরিস্কৃত হয়, শরীরের মল অপসারিত হয়, নিয়তচঞ্চল ফেনিল লবণাম্বুর পুনঃপুন সবেগ-স্পর্শে শরীরে উত্তাপবৃদ্ধি পায়, বাতরোগ বিদূরিত হয়, আর যে সকল রোগ কীটাণু-পুঞ্জের আশ্রয়ে জন্মিয়াছে; সেই সকল রোগের কীটাণুপুঞ্জও জলৌকার ন্যায় লবণাম্বুর সংস্পর্শে একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। পচা জীবদেহে, পচা উদ্ভিদে, পচা আবর্জ্জনায় দুষ্ট কীটাণুর বর্দ্ধন হয়, অগাধ অসীম আবর্ত্তময় লবণাম্বু রাশির বক্ষে কিছুই পচিতে পারে না, তাহাতে দুষ্ট কীটাণুরও অস্তিত্ব নাই।

যক্ষার কীটাণু মানুষের ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করিয়া সেইখানে ঘরবাড়ী করিয়া লয় সত্য, কিন্তু কেবল সেই কীটাণুই মানুষকে মারে না; দূষিত বায়ুর কৃপায় অন্যজাতীয় দুষ্ট কীটাণুও নাসারন্ধ্রের পথে ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করিয়া যক্ষার কীটাণুর সহায়তা করে। এই দ্বিবিধ কীটাণুর যুগপৎ আক্রমণ আর মানুষ সহ্য করিতে পারে না, অল্পদিনেই তাহার ভবলীলার শেষ হইয়া যায়। সমুদ্রবক্ষে অবাধ সঞ্চারী স্বচ্ছন্দ বিহারী বায়ুতে দুষ্ট কীটাণুর সম্পর্ক নাই; সুতরাং সেই নির্ম্মল বায়ুগ্রহণে যক্ষার কীটাণু আর নিজের সহায়তাকারী অন্যকীটাণু পাইতে পারে না। তাপের বৈষম্য যক্ষা-ক্রান্তের বিশেষ অপকারী, সমুদ্রে তাপের বৈষম্য নাই, সর্ব্বদা তাপের সাম্যই তাহাতে বিরাজ করে। এই তাপসাম্যেই সমুদ্রের বায়ু নাতিশীত, নাত্যুষ্ণ। এই বায়ু, এই তাপ

যক্ষ্মাক্রান্তের উপকারী, হৃদরোগেও উপকারী, শ্বাস রোগেও উপকারী। কেন উপকারী বলিতে গেলে অল্পকথায় হয় না, অনেক কথা বলিতে হয়।

মেঘের উপরে মেঘ পড়াতে মেঘে যেমন বিদ্যুতের সঞ্চার হয়; সেইরূপ তরঙ্গের উপরে প্রবলবেগে তরঙ্গ পড়াতে সমস্ত সমুদ্র বিদ্যুন্ময় হইয়া উঠে; সেই বিদ্যুৎ সাগরবিহারী বায়ুকে মুহূর্ত্তে অম্লজানে পরিণত করে, আবার বিদ্যুতের সংস্পর্শে সেই অম্লজান বায়ু মুহূর্ত্তে ওজনে (ভঙ্গপ্রবণ বায়ুতে) পরিণত হয়। ওজন আবার দূষিত পদার্থের সম্মুখীন হইলে মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সহস্র সহস্র ভাগে বিভক্ত হইয়া 'ও' রূপ (বায়ুবিশেষের রূপ) ধারণ করে। এই 'ও' এর এত শক্তি বাড়ে যে, সে সেই দুষ্ট কীটাণুরাশিকে ও তাহার বিষকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হয়। সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্রে, চিকিৎসাশাস্ত্রে বা কাব্যসাহিত্যে অম্লজান, ওজন 'ও' প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত কোন শব্দ এ পর্য্যন্ত স্পষ্টতঃ পাই নাই। না পাইবার অনেক কারণ আছে, জল-বায়ুদোষে অনেক পুস্তক নষ্ট হইয়াছে, অনেক পুস্তক অগ্নি ও কীটে নষ্ট করিয়াছে, রাশিরাশি পুস্তক বর্ব্বর সেনানীর হস্তে অগ্নিসাৎ হইয়াছে, অনেক পুস্তক অধ্যয়ন অধ্যাপনার অভাবে হতাদরে জীর্ণ হইতে হইতে মৃত্যুমুখে পড়িয়াছে। যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহার অনেকগুলি দুর্লভ, সুলভ পুস্তকের মধ্যেও সকলগুলি পুস্তকে চক্ষুঃ সংযোগ হয় নাই, চক্ষুঃসংযোগ হইলেও সমস্ত অংশের অর্থাবগতি করিতে সামর্থ্য হয় নাই। নয় ত যে আর্য্য ঋষিগণ প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এই পাঁচপ্রকারে ও নাগ, কূর্ম্ম, বৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয় এই পাঁচপ্রকারে বায়ুকে বিভক্ত করিয়াও সন্তুষ্ট হয়েন নাই, আবার উনপঞ্চাশৎ প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন; তাঁহারা যে সামান্য অম্লজান, ওজন 'ও' জাতিতেন না, একথা বলিতে পারিনা। না জানিলেই বা কেন তাঁহারা ধর্ম্ম-ব্যাজে সমুদ্র-তীরে বাসের ব্যবস্থা দিয়াছেন? যে বায়ু গ্রহণ করিয়া আমরা জীবন রক্ষা করি; তাহার নাম প্রাণবায়ু, যাহা ত্যাগ করি, তাহার নাম অপানবায়ু। এই প্রাণবায়ুকে কি অম্লজান বলা যাইতে পারে না? স্বাস্থ্যের কথা বলিলে, রোগবিনাশের কথা বলিলে, শরীর রক্ষার কথা তুলিলে, ধর্ম্মপ্রাণ ভারতের নরনারী শুনিবে না; জগতের একান্ত কল্যাণ কাম ঋষিবৃন্দ সেইজন্য সেই কথা না উঠাইয়া সমুদ্রকে তীর্থরাজ বলিয়াছেন। সমুদ্রের জলে দাঁড়াইয়া অর্ঘমর্ষণ মন্ত্রজপ ও সন্ধ্যা তর্পণ করিবার বিধিপ্রদর্শন করিয়াছেন, পুণ্যতীর্থ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, পুণ্যতিথিতে অব-গাহন স্নানের ব্যবস্থা দিয়াছেন, সমুদ্রে স্নান, দান, তর্পণ, শ্রাদ্ধ, পূজা—যাহা করিবে, তাহাতেই অনন্ত ফল হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, দুন্দুভিনাদে এইরূপ ঘোষণা করিয়াও তাঁহারা পরিতৃপ্ত হয়েন নাই, মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নকে আদেশ করিয়া সমুদ্রতীরে দেবাদিদেব পুরুষোত্তমের ত্রিমূর্ত্তির স্থাপন করাইয়াছেন। শক্তির উপাসকদিগকে পীঠভূমি বলিয়া বিমলার অধিষ্ঠান বিমলাক্ষেত্র বলিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন, আবার শৈবদিগকে সপ্তকল্পান্তজীবী মার্কণ্ডেয় ঋষির আশ্রম দেখাইয়া মার্কণ্ডেয় পূজিত মার্কণ্ডেয়েশ্বরের পূজার উপদেশ দিয়াছেন, ও এস্থানে অবস্থিতি করিলে অল্পায়ুও দীর্ঘজীবন লাভ করে ইঙ্গিত করিয়াছেন। সমুদ্রতীরে অদূরে সৌরদিগের জন্য কোণার্কে স্বতন্ত্র

ভাস্করক্ষেত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। গাণপত্য-দিগের জন্যও গণেশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই সকল ব্যবস্থা দেখিয়া ও শুনিয়া কি বলিব, আর্য্য ঋষিগণ সমুদ্রতীরে বাসের উপকারিতা জানিতেন না? সমুদ্রজলে অবগাহনের রোগ-সংহারতা বুঝিতেন না? ধর্ম্মশাস্ত্রের অনেক উপদেশেই যে চিকিৎসা শাস্ত্রের অনেক ব্যবস্থা নিহিত আছে, যিনি মহর্ষি জৈমিনি প্রণীত পূর্ব্বমীমাংসা অধ্যয়ন করিয়াছেন; তিনি তাহা জানেন। এই পুণ্যক্ষেত্রে বাস করিবার জন্য ঋষি বলিয়াছেন, "সংবৎসর মুপোষিত্বা মাসত্রয় মথা পিবা। তেন যষ্টং হুতং তেন তেন তপ্তং তপো মহৎ। সযাতি পরমং স্থানং যত্র যোগেশ্বরো হরিঃ। যে ব্যক্তি সংবৎর কাল, অগত্যা তিন মাস কাল এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বাস করিয়া (অন্যত্র না যাইয়া) অবস্থান (উহ) করে; তদ্বারা সে মহতী দেবপূজা, মহাযজ্ঞ, মহতীতপস্যা করিয়াছে; যেস্থানে যোগেশ্বর হরি বাস করেন; দেহাবসানে (উহ) সেই পরমস্থানে তাহার গতি হয়।

"বার্ষিকাং চতুরোমাসান্ যাবৎ স পুরুষোত্তমে। কাশীবাস যুগান্যাটৌ দিনেনৈ কেন লভ্যতে"। আটযুগ পর্য্যন্ত কাশীতে বাস করিলে যে পুণ্য হয়; বৎসরে চারিমাস পর্য্যন্ত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বাস করিলে তাহার একদিনে সেই পুণ্য হয়।

"বট সাগরয়োর্ম্মধ্যে যে ত্যজন্তি কলেবরং। তে দুর্লভংপরংমোক্ষমাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ"। অক্ষয়বট ও সমুদ্রের মধ্যস্থলে যে সকল ব্যক্তি দেহত্যাগ করে; তাহারা পরম দুর্লভ মুক্তি লাভ করে, এ বিষয়ে সংশয় নাই। কত বচন দেখাইব? উদ্ধৃত বচন কয়েকটির ন্যায় পুরাণ শাস্ত্রে অনেক বচন আছে, অনেক আখ্যায়িকা আছে। বিমলস্বাস্থ্যে যাহার দেহপুষ্ট, মনঃ হৃষ্ট ও সবল; সে কখনও মৃত্যুর জন্য চিন্তা করে না, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয় না, যাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে, উৎকটরোগের হাতে পড়িয়া চিকিৎসায় যাহার কোন ফল হইতেছে না; সেই ব্যক্তিই মৃত্যুসম্মুখীন হইতেছে মনে করে, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়; তাহাকেই ঋষি "বটসাগরয়োর্ম্মধ্যে" ইত্যাদি বলিয়া মোক্ষের প্রলোভনে প্রলোভিত করিয়া রোগমুক্তির উদ্দেশে সমুদ্রতীরে বাসের ব্যবস্থা দিতেছেন। যিনি একবৎসরকাল—অন্ততঃ তিনমাসকাল সমুদ্রতীরে বাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন, সকলের পক্ষে প্রতিবর্ষে চারিমাস সমুদ্রতীরে বাসকরা কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহার যে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে কতদূর পারদর্শিতা ছিল ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়, ঋষিদিগের উপরে ভক্তিস্রোতঃ বর্দ্ধিত হইয়া পড়ে।

"প্রাণস্ত্বং সর্ব্বভূতানাং যোনিস্ত্বং সরিতাংপতিঃ।
তীর্থরাজ নমস্তভ্যং ত্রাহিমামচ্যুতপ্রিয়"।
"ত্বমগ্নি র্দ্বিপদাং নাথ রেতোধাঃ কাকদীপনঃ।
প্রধানঃ সর্ব্বভূতানাং জীবানাং প্রভুরব্যয়ঃ"।
"অমৃতস্যারণিস্ত্বংহি দেবযোনি রপাং পতিঃ।
বৃজিনং হরমে সর্ব্বং"—
"অগ্নিশ্চ তেজো বড়বাচ র্দেহো রেতোধাঃ"।
ইত্যাদি ইত্যাদি।

তুমি সকল প্রাণীর প্রাণ; সকল প্রাণীর উৎপাদক, অচ্যুতপ্রিয় (ভগবানের প্রিয়, বা চ্যুত হয় না প্রিয় যাহা হইতে) তোমাকে নমস্কার, তুমি আমার নিস্তার কর। হে নাথ, তুমি দ্বিপদদিগের (মনুষ্যদিগের) অগ্নি, তুমি তাহাদিগের রেতোধাঃ (বীর্যধারণকারী বা বীর্য্যদানকারী) তুমি তাহাদিগের কাক-দীপন (কাকের জঠরাগ্নির ন্যায় জঠরা-

গ্নির—উদ্দীপক) পঞ্চভূতের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ, তুমি সর্ব্বজীবের প্রভু (রক্ষাকর্ত্তা) তুমি সমস্ত পাপ নষ্টকর। সমুদ্রই অগ্নি, সমুদ্রই বড়বা ; সমুদ্রই দেহ, সমুদ্রই রেতোধাঃ।

যখন বায়ুকে প্রথমে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার একটি বায়ুর নাম প্রাণ বলা হইয়াছে ; তখন বুঝিতে হইবে, সংস্কৃত সাহিত্যে যে বায়ুকে জগৎপ্রাণ বলা হইয়াছে, সে জগৎ প্রাণ অর্থে সমস্ত বায়ু নহে, বায়ু বিশেষ। এই বায়ু সমুদ্রে নিয়ত উৎপন্ন হইতেছে, এইজন্য মন্ত্রে সমুদ্রকেই প্রাণীর প্রাণ বলা হইয়াছে। "অপেয়শ্চ মহোদধিঃ" ইত্যাদি বলিয়া ঋষি সমুদ্রের জলপান অকর্ত্তব্য বলিয়া নিষেধ করিয়াছেন।* লবণ স্বাদ ও তিক্তস্বাদ বলিয়াই কেবল নিষিদ্ধ নহে, অজীর্ণতার উৎপাদন করে বলিয়াও সমুদ্রজল নিষিদ্ধ, এরূপ অবস্থায় কাকের জঠরাগ্নির ন্যায় সমুদ্র জঠরাগ্নির উদ্দীপক কি করিয়া হয় চিন্তা করিবার বিষয়। সমুদ্রতীরে বাস করিলে নানাপ্রকারে স্বাস্থ্যোন্নতি হয়, শরীরের উন্নতি, শারীরিক যন্ত্রের উন্নতি হয়, শরীর সবল হয়। ঋষি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন ; "জীর্ণত্বচইরোরগঃ" সর্প যেমন পুরাতন ত্বক্ ত্যাগ করিয়া নব কলেবর লাভ করে ; সমুদ্রতীরে বাস করিলে মানুষও সেইরূপ পূর্ব্ব শরীর ত্যাগ করিয়া নব কলেবর লাভ করে। শারীরিক বল লাভ করিলে তাহার জীর্ণ করিবার শক্তিও বাড়ে ; এইজন্য মন্ত্রে "কাকদীপনঃ" পদ রহিয়াছে, আর যদি "কাকদীপনঃ" না হইয়া "কাম দীপনঃ" পাঠ হয় ; তবে আর তাহার ব্যাখ্যা করিবার জন্য বেগ পাইতে হয় না। "অমৃতস্যারণি" অর্থ কি? ভাববাচ্যে ক্ত প্রত্যয় করিলে মৃত অর্থে মৃত্যু বুঝায়, মৃত্যুর অভাব অমৃত, অমৃত্যু অর্থ জীবন, জীবন আত্মা নয়। মোটরকার বা ট্রেনের কল বিগড়াইলে বা তাহাতে তাপ না থাকিলে কেহ তাহাতে আরোহণ করে না ; সেইরূপ শরীরের যন্ত্র বিগড়াইলে বা তাপ না থাকিলে তাহাতে আর আত্মার অধিষ্ঠান থাকে না ; সুতরাং শরীর যন্ত্রের পরিচালন ও শরীরস্থ তাপই জীবন। সমুদ্র—ফুস্‌ফুস্ ও হৃদয় যন্ত্রের উপকারক ; এজন্য সমুদ্রকে অমৃতের অরণি বলা হইয়াছে। আর্য্য বিজ্ঞানে অগ্নি, বিদ্যুৎ, তাপ—এ সমস্তকে সামান্যতঃ অগ্নি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। তাপ যখন অগ্নি—তাহাকে জ্বালাইবার জন্য কাষ্ঠ চাই, এই কাষ্ঠ সমুদ্র ; কাষ্ঠেরই নামান্তর অরণি। সমুদ্র মন্থনের আখ্যায়িকা ভারতবাসী মাত্রেই অবগত রহিয়াছে। এই মন্থন কার্য্যের পরিসমাপ্তি আজও হয় নাই। তরঙ্গের উপরে তরঙ্গের সবেগে পতন ও সেইরূপ আলোড়নই সমুদ্র মন্থন ; সেই মন্থনের ফলে বিদ্যুতের আবির্ভাব, তাহার ফলে বিশুদ্ধ অম্লজানের আবির্ভাব ; সেই অম্লজানই অমৃত—সুধা। নাসারন্ধ্রে সেই সুধা পান করিয়া মানব অমরত্ব লাভ করে, এতত্ত্বও আমরা সেই মন্ত্রস্থ 'অমৃতস্যারণি" এই পদদ্বয়ের অর্থে অবগত হই। সমুদ্রস্থ বিদ্যুতের নাম বাড়বাগ্নি ও ফস্‌ফরাসের নাম ঔষধ।

বড়বা শব্দের অভিধানিক অর্থ ঘোটকী ; সমুদ্রের তরঙ্গগুলি ঘোটকীর মত তীরের দিকে ছুটিয়া আসে ; সেই জন্য কবির ভাষায় তাহাকে বড়বা বলা হইয়াছে। সেই বড়বা হইতেই সামুদ্রিক বিদ্যুতের উৎপত্তি ; সেইজন্য তাহার নাম বাড়ব। সেইজন্য মন্ত্রে সমুদ্রের সমস্ত দেহকেই বড়বাময় বলা হইয়াছে। "রেতোধা" শব্দের অর্থ=স্পষ্ট। শাস্ত্রে স্বহস্ত পক্ক অন্ন ভোজনেরই প্রশংসা, তাপের সমতা

বিধানের উদ্দেশেও সমুদ্রতীরে রোগীর পক্ষে বাসের ব্যবস্থা; আগুন জ্বালাইয়া আগুনের কাছে বসিয়া স্বহস্তে পাক করিলে তাপের বৈষম্য হইবে; এইজন্য স্বয়ং পুরুষোত্তম প্রকাণ্ড হোটেল খুলিয়া বসিয়াছেন। শাস্ত্রকার ঋষিরাও উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, এই ক্ষেত্রে পাক করিয়া খাইবে না, খাইলে পাপ হইবে, এই হোটেলের অন্ন না খাইলেও পাপ হইবে। উড়ে ঠাকুরেরা সম্প্রতি বঙ্গ গৃহিণীদিগের শিষ্যত্বে আদ্যার সন্তার প্রভৃতি শিখিয়াছে; পূর্ব্বে জানিত না, তাহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরাও জানিত না; আদি ঠাকুর ও আদি ঠাকুরাণী আর কি করিয়া তাহা জানিবেন? তারপর তাঁহাদিগের হাতের আগাও নাই, কষ্টে সৃষ্টে না হয় একবার হাঁড়ী উঠাইতে ও নামাইতে পারেন; পুনঃ পুনঃ নামান উঠান তাঁহাদিগের সাধ্যাতীত; কাজে কাজে সন্তার, সাতলান প্রভৃতি তাঁহাদিগের দ্বারা হওয়া একেবারেই অসম্ভব। এজন্য ইন্দুমাধব মল্লিকের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের জন্মিবার যুগ যুগান্তর পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত ইউপিক্‌কুকারে তাঁহারা সেই হোটেলের অন্ন ব্যঞ্জনাদি সমস্তই রাঁধিতেন। এখন ভাবিয়া দেখুন, এইরূপ প্রসাদী অন্ন ব্যঞ্জন কত সহজে হজম হইয়া যাইতে পারে; রোগীর পক্ষেও ভাল, ভোগীর পক্ষেও ভাল। এক প্রসঙ্গে অনেক বলিলাম, আর বলিব না, আধ্যাত্মিকতার কথা আর উঠাইব না।

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন।

সার্জ্জন-সুশ্রুত।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

(ধাত্রী-বিদ্যা।)

ধাত্রী বিদ্যায় সুশ্রুতের কিরূপ পারদর্শিতা ছিল, নিম্নে তাহার একটু আভাষ দিতেছি।

সুশ্রুত গর্ভস্থিত মৃত সন্তান বাহির করিয়ার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে শিষ্যগণকে উপদেশ দিতেছেন; —"যদি গর্ভস্থ মৃত সন্তান হাতের সাহায্যে বাহির করিতে না পার, তাহা হইলে অস্ত্র দ্বারা ভ্রূণ ছেদন করিয়া বাহির করিবে। কিন্তু সাবধান—সন্তান জীবিত থাকিলে, কখনও অস্ত্র প্রয়োগের চেষ্টা করিও না, তাহাতে গর্ভ ও গর্ভিণী উভয়েরই বিপদ ঘটিতে পারে। মৃত সন্তান প্রসব করাইবার পূর্ব্বে, গর্ভিণীকে মধুর বচনে আশ্বস্ত করিবে। তাহার পর মণ্ডলাগ্র নামক অস্ত্রের দ্বারা ভ্রূণের মস্তক বিদীর্ণ করিয়া ফেলিবে, এবং খর্পর গুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া শঙ্কু অর্থাৎ আকর্ষণী অস্ত্রের সাহায্যে বাহির করিবে। শেষে বক্ষঃ ও কক্ষ-দেশ ধরিয়া ধীরে ধীরে মৃত সন্তানকে বাহির করিবে। যদি মস্তক বিদীর্ণ করিতে না পার,

তাহা হইলে অক্ষিপুট ও গণ্ডদেশ ধরিয়া সন্তানকে বাহিরে আনিবে। সন্তানের স্কন্ধদেশ অপত্য পথে আবদ্ধ হইলে, বাহুদ্বয় ছেদন করিবে। ভ্রূণের উদর বায়ু কর্ত্তৃক ফুলিয়া থাকিলে, তাহা চিরিয়া অন্ত্র সমূহ বাহির, করিয়া ফেলিবে। ইহাতে শিশুর দেহ শিথিল হইয়া পড়ায় তাহাকে অনায়াসে বাহিরে আনা যায়। জঘন-দেশ দ্বারা অপত্য পথ অবরুদ্ধ হইলে, জঘনাস্থি ছেদন করিবে। * * মৃতগর্ভ নিষ্কাসনের পক্ষে মণ্ডলাগ্র অস্ত্রই খুব ভাল। তীক্ষ্ণাগ্র বিশিষ্ট বৃদ্ধি পত্র অস্ত্র প্রয়োগে গর্ভিণীকে আঘাত লাগিতে পারে।"

অতি সংক্ষেপে আমি মহর্ষির উপদেশের মর্ম্মানুবাদ লিপিবদ্ধ করিলাম। বলিতে লজ্জা হয়—সেই সুশ্রুতের বংশধর আমরা—গর্ভস্থ মৃত সন্তান ছেদনের কথা শুনিলে এখন আমাদের হৃদ্ কম্প হইয়া থাকে। প্রসব-সাধনের প্রধান অস্ত্র মণ্ডলাগ্রের আকারও আমরা চ'ক্ষে দেখিবার সুযোগ পাইলাম না! এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য!

বন্ধন।

পতন, আঘাত প্রভৃতি কারণে দেহের অস্থি সমূহ ভগ্ন হইলে, "বন্ধনের" প্রয়োগ করিতে হয়। বন্ধনের ইংরাজী নাম Bandage. অস্ত্র প্রয়োগের পর আহত বা ক্ষত স্থানেও অস্ত্র চিকিৎসকগণ বন্ধনের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। সুশ্রুত এই বন্ধন ব্যাপারেও বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে অনেকগুলি বন্ধনের নাম পাওয়া যায়। যথা;—১। কোশ বন্ধন, ২। দাম বন্ধন, ৩। স্বস্তিক বন্ধন, ৪। তন্তু বেল্লিত বন্ধন, ৫। ছ তোলী বন্ধন, ৬। মণ্ডল বন্ধন, ৭। সুগিকাবন্ধন, ৮। যজক বন্ধন, ৯। খট্টা বন্ধন, ১০। চীল বন্ধন, ১১। বিবন্ধ বন্ধন, ১২। বিতান বন্ধন, ১৩। গোফণা বন্ধন, ১৪। পঞ্চাঙ্গী বন্ধন। এই সকল বন্ধনের প্রণালীই য়ুরোপের ডাক্তার-গণ ভারতবাসী বৈদ্যের কাছে বহুযুগ পূর্ব্বে শিক্ষা করিয়াছিলেন।" 'ভারতী' পত্রে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ, মহাশয় চিত্রের সাহায্যে তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন।

সুশ্রুত বন্ধন কার্য্যের জন্য প্রয়োজনমত—কার্পাস বস্ত্র, মেষ লোম নির্ম্মিত বস্ত্র, রেশমী-ক্ষৌম বস্ত্র, চর্ম্ম, বংশাদির চটা বা চেয়াড়ী, সূত্র, লৌহ এবং কাষ্ঠ ফলক প্রভৃতি ব্যবহার করিতেন। দেহের স্থান বিশেষে যেরূপ যেরূপ বন্ধন সু-নিবিষ্ট হইতে পারে, সুশ্রুত তাহা উত্তমরূপেই অবগত ছিলেন। এই সকল বন্ধন আবার তিন প্রকার ছিল। যে বন্ধন খুব শক্ত অথচ বেদনা প্রদ নহে, তাহার নাম ছিল—"গাঢ় বন্ধন"। যে বন্ধনের ভিতর দিক ফাঁপা থাকিত তাহার নাম "শিথিল বন্ধন"। যে বন্ধন খুব শক্তও নহে, শিথিলও নহে—তাহার নাম "সমবন্ধন"।

সুশ্রুত শুধু সার্জ্জন ছিলেন না, তিনি এক জন ফিজিসিয়ান ও ছিলেন। সুশ্রুত সংহিতায় কায় চিকিৎসার অনেক অমূল্য উপদেশ আছে। কায় চিকিৎসক-শিরোমণি চরক ৫০০ ভেষজের উল্লেখ করিয়াছেন, ৩৭টী গুণে সুশ্রুত ৭৬০ টী গুণ বর্ণনা করিয়াছেন। সুশ্রুতের গ্রন্থে আমরা বিবিধ লবণ, ধাতু দ্রব্য, এবং নানা খনিজ পদার্থের ঔষধার্থে প্রয়োগ দেখিতে পাই।

সুশ্রুতের মতের আদর।

আজ কাল যে সকল রোগে অস্ত্র প্রয়োগ অতি কঠিন বলিয়া সুধীগণ স্বীকার করিয়া

থাকেন, সুশ্রুতের সময় তাহার অধিকাংশই প্রচলিত ছিল। major operation. Amputation. Abdominal Section—সুশ্রুত এসব ভালরকম জানিতেন। ৯৭৭ খৃঃ পূঃ অব্দে ও—ভারতে সুশ্রুতের অস্ত্র চিকিৎসা প্রচলিত ছিল। পাঠক মহাশয় বল্লাল পণ্ডিতের "ভোজ প্রবন্ধ" পড়িলে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাইবেন সুশ্রুত এবং তাঁহার মতাবলম্বী শল্য বৈদ্যগণ রোগীর শরীরে অস্ত্র প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে, "সম্মোহিনী" ঔষধ প্রয়োগ করিয়া রোগীর জ্ঞান তিরোহিত করিতেন। অস্ত্র চিকিৎসার পরে, "সঞ্জীবনী" নামক ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহারা রোগীর চেতনা সম্পাদন করিতেন। এখন ডাক্তারদের "ক্লোরোফর্ম্ম" "সম্মোহিনীর" স্থান অধিকার করিয়াছে, কিন্তু "সঞ্জীবনীর ন্যায় কোনও ঔষধ অদ্যাবধি য়ুরোপের Pharmacopocu তে দেখিতে পাওয়া যায় না।

খৃষ্টীয় যুগের প্রারম্ভে আরব দেশের বিখ্যাত চিকিৎসক সিরারিয়ন, স্ব প্রণীত চিকিৎসা-গ্রন্থে, সুশ্রুত ও চরকের বহু মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। আফলাটুন্ (Aflutoon) নামক মুসলমান চিকিৎসক নবম শতাব্দিতে ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ইঁহার গ্রন্থে সুশ্রুত প্রভৃতির নাম স-সম্মানে উন্মিলিত হইয়াছে। ৭ম শতাব্দিতে খালিফ্ আল্ মল্ সুরের আদেশ, "সুশ্রুত সংহিতা" আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। ঐ গ্রন্থ "খালেল সাশুর আল হিন্দি" [Khalale Shaw shooral Hindi] নামে পরিচিত। ৮ম সময় "চরক" প্রভৃতি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ ও আরবী ভাষায় অনুবাদিত হয়। এই সকল অনুবাদিত গ্রন্থ আবার লাটিন্ ভাষায় অনুবাদিত হয়। সেই সকল অনূদিত গ্রন্থই য়ুরোপীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তি। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দি পর্য্যন্ত, য়ুরোপে চিকিৎসা শাস্ত্র, ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিল। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণ—মুক্তকণ্ঠে ইহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। গোড়ার কথাটা যাঁহারা ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পান না,—"আয়ুর্ব্বেদের" বিজ্ঞান রহস্য যাঁহাদের ভেদ করিবার শক্তি নাই, আয়ুর্ব্বেদের বিরাট বিস্তৃতি যাঁহারা কখনও চ'ক্ষেও দেখেন নাই, কেবল সেই ক্ষীণ বুদ্ধি, মোহ মুগ্ধ ব্যক্তির কাছেই আয়ুর্ব্বেদ—Quackery! প্রার্থনা করি ভগবান্ এরূপ আত্মঘাতী মানবের মনোদৈন্য নিবারণ করুণ। ইহারা আয়ুর্ব্বেদের অঙ্গে বিশ্বরূপের প্রকট মহিমা দেখিয়া জীবন সার্থক করুক।

প্রসিদ্ধ চিকিৎসক মহাত্মা নুরুদ্দীন মহম্মদ আবদুল্লা সিরাজী সাহেব, সম্রাট সাহজাহানের পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন। ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি যে "আল্ ফাজেল আদ্বিচ" [Alfazl Adwich] নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে সুশ্রুতোক্ত অনেকগুলি ঔষধই গৃহীত হইয়াছে। সম্রাট্ ঔরংজেবের প্রিয়তম হাকিম মহম্মদ আকবর মার্জ্জানি, ১৬৫৮ খৃঃ অব্দে "কারাবাদিন্ কাদেরি" (Karabadine Kaderi) নামক গ্রন্থে সুশ্রুতের বহু ব্যবস্থা অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতে বেশ বুঝা যায়—অবনতির দিনেও, মুসলমান প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে হিন্দুর আয়ুর্ব্বেদ কত আদৃত ছিল।

সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা কে?

আমরা দেখিলাম—সুশ্রুত একজন বড়-দরের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ছিলেন।

রসায়ন-শাস্ত্রে তাঁহার রীতিমত অধিকার ছিল। কিন্তু তাহার গ্রন্থখানি কেবল চিকিৎসা-শাস্ত্র নহে,—তাহাকে ধর্ম্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, ব্যবহার শাস্ত্র, এমন কি সকল শাস্ত্রের সমন্বয় বলিতে পারা যায়। বিশ্ব রহস্যের বিপুল আবর্ত্তনে—তাঁহার ঋষিত্ব গঠিত হইয়াছিল। তাঁহার সর্ব্ব ভেদিনী দূর প্রসারিণী অক্ষুণ্ণ দিব্য দৃষ্টি—মানব-মর্ম্মের মায়ালোকে প্রবেশ করিয়া, যে অপার্থিব রত্নরাজি আহরণ করিয়াছিল, তাহা তাঁহারই অমর-রথি-রেখাময়ী সংহিতা খানিকে জগতের চিরন্তন সম্পত্তিরূপে পরিণত করিয়াছে! যিনি সুশ্রুত পাঠ করিবেন, তিনিই বুঝিবেন—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ণ জ্ঞান—কেবল মানব দেহ হইতেই লাভ করা যায়। সুশ্রুতের প্রত্যেক "স্থান"—প্রতিভার জ্বালাময় ফুৎকারে উদ্দীপ্ত-চেতন, প্রত্যেক অধ্যায়—বিজ্ঞানের হিল্লোলে ও কল্লোলে স্পন্দমান, প্রত্যেক শ্লোক ওঙ্কারের মত পবিত্র! সুশ্রুতের ভাষা সুন্দর, সরল, যেন অবিরাম গতিতে অনাবিল জলস্রোতের ন্যায় কলকলে ছুটিয়া চলিয়াছে! তাহাতে আবেগ আছে, আবর্ত্ত নাই, কল্লোল আছে, কোলাহল নাই। একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধে—সুশ্রুতের সকল কথা আলোচনা করিতে পারি, আমার সে শক্তি নাই। সুতরাং সমালোচনা হিসাবে আজ আমার ক্ষীণ উদ্যম নিতান্তই নিস্ফল। আমার সৌভাগ্য—যৌবনোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে আমি সুশ্রুত পাঠের একটু সামান্য অধিকার লাভ করিয়াছিলাম। ভিষক কুল তিলক পাতিলপাড়া নিবাসী শ্রীমল্লোক নাথ মল্লিক মহোদয়ের চরণ তলে বসিয়া অস্ফুট অভ্যর্থনায় আমি সুশ্রুতকে বন্দনা করিবার অবকাশ পাইয়াছিলাম। সাধক যেমন একে একে পদ্মবীজ মালার এক একটী বীজ ধরিয়া মন্ত্রের আবৃত্তি করে, আমিও তেমনি এক একটী করিয়া সুশ্রুতের মহাশ্লোক মালা জীবন-মন্ত্রের মত উচ্চারণ করিয়াছিলাম। কিন্তু কৈ সিদ্ধিলাভ করিতে ত পারি নাই। এখনও ইচ্ছা হয়—যোগ্যগুরুর মুখোদগীর্ণ সুশ্রুতোক্তি কর্ণভূষণ করিয়া জন্ম ও জীবন সার্থক করি। কিন্তু হায়, সেরূপ গুরু যে আর খুঁজিয়া পাইনা। সে ঋষির আত্মা যে চিরদিনের মতই নেপথ্য-চারী হইয়া রহিয়াছে!

সুশ্রুত সম্বন্ধে আর আমার একটী কথা বলিবার আছে। বৈদ্য সমাজের বিশ্বাস—বৌদ্ধ নাগার্জ্জুন সুশ্রুত সংহিতার প্রতি সংস্কার করিয়া গিয়াছেন। আমি কিন্তু এ মত সমর্থনের কোনও প্রমাণ এ পর্য্যন্ত দেখিতে পাই নাই। আপনারা বলিবেন,—"কেন প্রমাণের অভাব কি? সুশ্রুতের টীকাকার স্বয়ং ডল্লনাচার্য্যইত এ কথা বলিয়া গিয়াছেন।" আমি কিন্তু ডল্লনাচার্য্যের কথা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়া লইতে অক্ষম। কেননা, ডল্লনাচার্য্য নাগার্জ্জুনকে যে সুশ্রুতের প্রতি সংস্কার কর্ত্তা বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারই যেন সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে। সুশ্রুতের এক স্থানে "সুভূতি গৌতম" এই নামটি দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাতেই যত গোলযোগের সৃষ্টি। মহাত্মা চক্রপাণি দত্ত—সুশ্রুতের টীকাকার গণের অন্যতম। নাগার্জ্জুন—সুশ্রুতের প্রতি সংস্কর্ত্তা—ডল্লনের এই কথায় চক্রপাণিও একটু সন্দিগ্ধ হইয়াছেন।

সংহিতাগ্রন্থে সাধারণতঃ চারিপ্রকার সূত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই চারি প্রকার সূত্র মধ্যে প্রতি সংস্কর্ত্তার রচিত সূত্রও নিশ্চয় থাকিবে। কবিরাজ মহাশয়গণ অবশ্যই ইহা

জানেন। অগ্নিবেশ কৃত সংহিতার মহর্ষি চরক সংস্কার করিয়াছিলেন, আবার চরক সংহিতারও অংশ বিশেষ "দৃঢ়বল" কর্ত্তৃক প্রতি-সংস্কৃত হইয়াছিল। চরক গ্রন্থেই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। সুশ্রুতগ্রন্থে সেরূপ স্পষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। সুশ্রুতের প্রতি সংস্কর্ত্তা থাকিলে সুশ্রুত গ্রন্থেই তাহার উল্লেখ থাকিত। অনেকে "সুভূতি গৌতম" নামক বুদ্ধদেবের শিষ্যকে সুশ্রুতের প্রতি সংস্কারক বলেন। কিন্তু ইহাকেও প্রমাণ বলা যায় না. বরং অনুমান বলা চলে। বিশেষতঃ গৌতম নামটি বংশ পরিচায়ক, শাক্য সিংহের বহুকাল পূর্ব্বে উহা যে বর্ত্তমান ও প্রসিদ্ধ ছিল একথা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে।

পক্ষান্তরে—সুশ্রুত সংহিতার সর্ব্বত্রই আমরা সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের অনুশাসন দেখিতে পাই। বৌদ্ধ নাগার্জ্জুন যদি সুশ্রুতের প্রতি সংস্কার করিবেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এরূপ থাকিত না। বেদ বিরোধী বৌদ্ধ কর্ত্তৃক বৈদিক অনুশাসন কখনই সমর্থিত হইতে পারে না। সুশ্রুতের কোন স্থানেই—বৌদ্ধ ধর্ম্মের একটু আভাষও দেখিতে পাওয়া যায় না।

আবার নাগার্জ্জুনও একজন ছিলেন না। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ—অনেকগুলি নাগার্জ্জুন প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা জিজ্ঞাসা করি, যদি নাগার্জ্জুনকে সুশ্রুতের সংস্কারকর্ত্তা বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যায়—তবে তিনি কোন্ নাগার্জ্জুন? বৃন্দ; চক্রপাণি প্রভৃতি উত্তর কালীন তন্ত্রকারগণ এক নাগার্জ্জুনকে আচার্য্য' "রসায়নবেত্তা" "মুনীন্দ্র" ইত্যাদি সম্মানে সম্মানিত করিয়াছেন। নাগার্জ্জুন বহুশাস্ত্রের প্রণেতা। কিন্তু রসায়নবেত্তা নাগার্জ্জুন আর বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জ্জুন কি একই ব্যক্তি? আমরা "যোগসার" নামক একখানি গ্রন্থ পড়িয়া দেখিয়াছি, উহা নাগার্জ্জুন নামধেয় জনৈক আচার্য্যের লেখনী প্রসূত। এই গ্রন্থে মাধবকর, 'চক্রপাণি' বঙ্গসেন প্রভৃতি নব্য পণ্ডিতগণের নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি আবার কোন নাগার্জ্জুন? নাগার্জ্জুন—যিনি রসায়নবেত্তা বলিয়া বিখ্যাত —তিনি ত বাগভটের ও পূরোবর্ত্তী।

সুশ্রুতে অনেক পাঠ পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং সুশ্রুতের ভিতর যুগ যুগান্তর ধরিয়া, বহু ব্যতিক্রম ঘটিয়া গিয়াছে। উহাতে অনেক অনবধান ও ভ্রম থাকিয়া গিয়াছে। সুতরাং কোনও অর্ব্বাচীন নামের উল্লেখ মাত্র দেখিয়া প্রাচীন সংহিতার বিচার করা সমীচীন নহে।

সুশ্রুতের গুরু ভগবান ধন্বন্তরি। এই জন্য —সুশ্রুত সংহিতাকে ধন্বন্তরি সম্প্রদায়ের গ্রন্থ বলিয়া অনেকেই প্রচার করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে—"চরক সংহিতা" আত্রেয় সম্প্রদায়ের গ্রন্থ। কিন্তু পৌরাণিক প্রমাণে আমরা দেখিতে পাই—

"তস্য গেহে সমুৎপন্নো দেব ধন্বন্তরি স্তদা।
কাশীরাজো মহারাজঃ সর্ব্বরোগ প্রণাশনঃ॥
আয়ুর্ব্বেদং ভরদ্বাজাৎ প্রাপ্যেহ স ভিষগ্‌জিতং।
তমষ্টধা পুনর্ব্বস্য শিষ্যেভ্যঃ প্রত্যপাদয়ৎ॥"

অর্থাৎ কাশীরাজ ধন্বের গৃহে ভগবান ধন্বন্তরি পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ভরদ্বাজের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন এবং সেই আয়ুর্ব্বেদকে আটভাগে বিভক্ত করিয়া শিষ্যগণকে শিক্ষা দেন।

এই পৌরাণিক কথায় বিশ্বাস করিতে হইলে,—আত্রেয় সম্প্রদায় ও ধন্বন্তরি সম্প্রদায়

এক হইয়া যায়। মৎপ্রণীত "আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাসে" আমি এ সকল কথার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। এইবার সুশ্রুতের মধ্যে যে বৈদিক অনুসাসন আছে, তাহারই দিঙমাত্র নির্দ্দেশ করিব।

সুশ্রুতের প্রথমেই আয়ুর্ব্বেদের গুরু পরম্পরা ধন্বন্তরি কর্ত্তৃক এইরূপে কথিত হইয়াছে,—"ব্রহ্মা প্রোবাচ, ততঃ প্রজাপতি রধিজগে, তস্মাদশ্বিনৌ, অশ্বিভামিন্দ্রঃ ইন্দ্রাদহং।" তাহার পর দীক্ষা-বিধির অনুষ্ঠান বৈদিক-বিধানে অনুপ্রাণিত। রোগীর রক্ষাবিধি সুশ্রুত যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেও দৈবাচারের পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। হোম স্বস্তিবাচন কিছুই বাদ পড়ে নাই। সুশ্রুতের আয়ুর্ব্বর্দ্ধক সন্নীতি ব্রাহ্মণ পুজায় ও বেদান্তাদি শাস্ত্রের অনুশীলন উপদেশে পরিপূর্ণ। সুশ্রুত দৈব ব্যাপাশ্রয় চিকিৎসা বিধিকেও উপেক্ষা করেন নাই। মন্ত্র শক্তিকেও অবিশ্বাস করেন নাই। স্মৃতিশাস্ত্রের সকল বিধান সুশ্রুত অবনত শিরে গ্রহণ করিয়াছেন। কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মফলকে প্রাধান্য দিয়াছেন। পূর্ব্ব জন্ম, পর জন্ম মানিয়া লইয়াছেন। যাগযজ্ঞের শুদ্ধসত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন সর্ব্বোপরি পারমেশ্বরী ইচ্ছাকেও প্রশ্রয় দিয়াছেন। যে গ্রন্থ এত মন্ত্র বহুল, যে গ্রন্থ এত ধর্ম্মভাবে পূর্ণ, যে গ্রন্থ এত যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী, সে গ্রন্থ কি নীরীশ্বর বৌদ্ধ মতাবলম্বী নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃত হইতে পারে? যদি ইহা হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বৌদ্ধ নাগার্জ্জুন সুশ্রুত হইতে বৈদিক প্রভাব একেবারেই দূর করিয়া দিতেন। সুশ্রুতের কোথাও না কোথাও বৌদ্ধমত লিপিবদ্ধ করিতেন। আয়ুর্ব্বেদের অপৌরুষেয়ত্ব অস্বীকার করিতেন। আমরা জানি, বৌদ্ধযুগে আয়ুর্ব্বেদ যথেষ্ট উন্নত হইয়াছিল, বৌদ্ধ নৃপতিগণ—জীবের কল্যাণ-কামনায় আয়ুর্ব্বেদের চর্চ্চা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অসীম অনুগ্রহের ফলে এ দেশে "আয়ুর্ব্বেদ কলেজ' পশুমানবের জন্য রুগ্নাবাস বা আতুরাশ্রম (হাসপাতাল) স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু বৌদ্ধগণ যে আয়ুর্ব্বেদের বৈদিকাচার অক্ষুণ্ণ রাখিবেন, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

মহর্ষি সুশ্রুতকে উদ্দেশ করিয়া—একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক বলিয়াছেন—"হে ঋষি! শুনিয়াছি তুমি সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলে। কিন্তু তুমি এ মর জগতে চিরকালই অমর হইয়া রহিয়াছ—তোমার রচিত সংহিতা চিরকালই তোমায় অমর করিয়া রাখিবে। তুমি যে অসামান্য অস্ত্র চিকিৎসার উপদেশ জগৎকে দিয়া গিয়াছিলে, আমরা ভারতবাসী হইয়াও তাহার সম্যক সমাদর করিতে পারি নাই, তোমার উপদিষ্ট অস্ত্র-শস্ত্র স্বচক্ষে কখন দেখিতেও পাইলাম না। আশীর্ব্বাদ কর—ভারতের অতীত গৌরবের, অতীত জ্ঞান, গরিমায়, অতীত স্বাধীন চিন্তার নিদর্শন স্বরূপ তোমার সংহিতার গৌরব করিবার অধিকার যেন আমরা কখনও বিস্মৃত না হই।"

আয়ুর্ব্বেদের সেই অস্ত্র চিকিৎসায় গৌরব রক্ষা করিবার জন্যই—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। সুশ্রুতের স্বর্গীয় আত্মা দেব-নির্ম্মাল্য নিক্ষেপ করিয়া—ইহার উদ্যোগকারিগণের প্রাণগত চেষ্টাকে সফলতায় মণ্ডিত করুন,—ভারতে আবার ঋষি-যুগ ফিরিয়া আসুক,—ভগবচ্চরণে ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ।

ম্যালেরিয়ার দেশীয় মহৌষধ।

—:*:—

আমি ডাক্তার। আমার কর্ম্মক্ষেত্র—পল্লীগ্রামে। আমার বাসগ্রামের আসে পাশে অনেকগুলি গ্রাম আছে। সে সকল গ্রামেও আমাকে সর্ব্বদা যাইতে হয়। আমি যে সকল রোগীর চিকিৎসা করিয়া থাকি, তাহার পনেরো আনাই ম্যালেরিয়া। আমার কর্ম্মাভ্যাস অর্থাৎ প্রাক্‌টিস ১৬ বৎসর চলিতেছে। সুতরাং ১৬ বৎসর কাল ম্যালেরিয়ার লীলাভূমিতে বাস করিয়া, অসংখ্য ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর চিকিৎসায় ব্যাপৃত থাকিয়া ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে আমার একটু অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে।

আমাদের বিজ্ঞান বলে—ম্যালেরিয়া দমন করিতে কুইনাইনের মত আর দ্বিতীয় ঔষধ নাই। এই বিশ্বাস আমারও বরাবর ছিল। যেখানেই দেখিয়াছি—"ম্যালেরিয়া" সেখানেই আমি রোগীকে উপদেশ দিয়াছি—"কুইনাইন মেব কেবলং।" কিন্তু এখন আমার মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কেন হইয়াছে? সেই কথাটাই বলিব।

বোধ হয় ৭।৮ মাস পূর্ব্বের কথা। আমার এক আত্মীয়াকে লইয়া তাহারই চিকিৎসার জন্য এক বয়োবৃদ্ধ ডাক্তারের পরামর্শ লইতে গিয়াছিলাম। সেখানে বন্ধুবর ব্রজবল্লভ বাবু এবং বঙ্কিম যুগের লোক দীননাথ ধর বি-এ বি-এল মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বিশ্রম্ভালাপ চলিতেছিল। সহসা এক ভদ্রলোক ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ডাক্তার বাবু! আগে ত এ দেশে এত জ্বর হইত না, এথম এমন ঘন ঘন জ্বর হয় কেন? ডাক্তার বাবু বলিলেন,—"আগে দেশের জল-বায়ু ভাল ছিল, তাই জ্বর হইত না, এখন জল বায়ু খারাপ হইয়াছে, দেশে ম্যালেরিয়া প্রবেশ করিয়াছে, তাই এত জ্বর হইতেছে।" ডাক্তার বাবুর কথায় বৃদ্ধ সুরসিক দীন বাবু একটু হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"তা' নয় ডাক্তার, আগে জ্বরের নাম ছিল "জ্বর" এখন তোমরা জ্বরের নাম দিয়াছ "ফিবার"—কাজেই সে হয়ও ফি—বার। "দীনবাবুর কথায় সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। ডাক্তারের পরামর্শ লইয়া আত্মীয়ার সঙ্গে আমি আমার বাস-গ্রামে ফিরিয়া আসিলাম। ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রপসনে নূতন কিছুই ছিলনা, আমি যাহা যাহা ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, অবিকল সে সমস্ত ঔষধ বজায় রাখিয়া তিনি কেবল কুইনাইনের মাত্রা একটু বাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

ঔষধ সেবন চলিতে লাগিল। কিন্তু যে জন্য অপর ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজন বুঝিয়াছিলাম, তাহার কিছুই হইল না। আমার আত্মীয়ার অসুখ এমন কিছু বেশী নহে, ২।৪ দিন অন্তর কাঁপিয়া জ্বর হয়। উপবাস দেন, কুইনাইন খান, জ্বর বন্ধ হয়। কিন্তু বেশী দিন বন্ধ থাকেনা। কুইনাইনের টনিক খাইতে খাইতেই আবার জ্বর হয়। জ্বরের এই পুনরাবর্ত্তনের কোন প্রতিকারই হইতে ছিল না। বড় বড় নাম জাদা পেটেণ্ট ঔষধ ব্যবহার করিয়াও জ্বর বেশী দিন বন্ধ থাকিতনা।

ফলে রোগিণী ডাক্তারী ঔষধের উপর বীতশ্রদ্ধ হইতেছিলেন, আমি বাড়ীর ডাক্তার—তাঁহাকে কেবল বুঝাইতেছিলাম—"আপনি ভাবিবেন না, জ্বর নিশ্চয়ই বন্ধ হইবে। এ ম্যালেরিয়া—ইহার একমাত্র ঔষধ—কুইনাইনমেব কেবলং!"

এইভাবে, দুইমাস কাটিয়া গেল। আমি ত সাধ মিটাইয়া কুইনাইন চালাইতে লাগিলাম। শেষে তিনি আর কুইনাইন খাইতে চাহেননা, কি করি? কুইনাইনের ইন্‌জেক্‌সন্ দিতে লাগিলাম। তাহার পরই তিনি আমার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য—পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন। পিত্রালয়—আমার বাস গ্রামের এক ক্রোশ দূরে, সে গ্রাম অতি ভয়ানক গ্রাম, ম্যালেরিয়ায় পরিপূর্ণ, সেখানকার লোক মরিয়া ভূত হয়, তথাপি ম্যালেরিয়া তাহাকে ছাড়ে না! এমন স্থানে তিনি প্রায় একমাস থাকিলেন। যখন ফিরিয়া আসিলেন, আমি আশ্চর্য্য হইলাম—তাঁহার জ্বর বন্ধ হইয়া গিয়াছে। একি স্থান পরিবর্ত্তনের গুণ? অসম্ভব! ম্যালেরিয়াগ্রস্থ স্থানে বাস করিলে কি ম্যালেরিয়া ভাল হয়? তবে কি? আত্মীয়াকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন—"বাপের বাড়ীতে গিয়া আমি আর এক দিনও কুইনাইন খাই নাই। আমার এক মাসী আছেন, তিনি আমাকে নাটার ডগা বাটিয়া খাইতে বলেন। তাহাতেই আমার জ্বর বন্ধ হইয়াছে। আমি ৫।৭টা নাটার ডগা শিলে বাটিয়া ৩টী বড়ী তৈয়ার করিয়া লই, সেই বড়ী মাঝে মাঝে একটা করিয়া জল দিয়া গিলিয়া খাই। নাটা—জ্বরে বড় উপকারী" একজন পাশ করা উপাধিধারী ডাক্তারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া একজন অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক বলিতেছে কিনা—নাটা জ্বরে বড় উপকারী। হা—ভাগ্য! ইহাও আমাকে শুনিতে হইল? যে জ্বর কুইনাইনে বন্ধ হয় নাই—সে জ্বর নাটায় বন্ধ হইল? ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা? আমার মুখে হাসি আসিল। আমি আত্মীয়াকে বলিলাম—বোধ হয় নাটার কাঁটার ভয়ে জ্বর আপনার দেহে প্রবেশ করিতে সাহস করে নাই! আমার কথায় তিনিও একটু হাসিলেন। আমি কিন্তু নাটার কথা মনে করিয়া রাখিলাম।

এই মহাযুদ্ধে সকল দ্রব্যই মহার্ঘ হইয়াছে। ডাক্তারী ঔষধের দাম চতুর্গুণ চড়িয়াছে, অনেক ঔষধ দুষ্প্রাপ্যও হইয়াছে। আমি পাড়াগেঁয়ে ডাক্তার, বিশেষতঃ গরীব-দুঃখী ও মধ্যবিত্ত লোক লইয়াই আমার কাজকর্ম্ম, ঔষধের মূল্য-বৃদ্ধি হওয়ায় আমি বড় বিব্রত হইলাম। অসুখ হইলেও লোকে হঠাৎ দেখাইতে চাহে না, কেননা ভিজিটের টাকা যোগাইবে কেমন করিয়া? ইহার উপর ঘরে ঘরে হোমিও-প্যাথীর বার্ণিস করা বাক্স, নিতান্ত দরিদ্রগণ বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথী ঔষধ সেবন করিতে লাগিল। বিনা চিকিৎসায় যাহাদের রোগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, কেবল তাহারই ডাক্তার ডাকিল। কিন্তু ইহাও প্রাণের দায়ে! কেননা দুই এক শিশি ঔষধ খাওয়াইয়াই তাহারা চিকিৎসা বন্ধ করিয়া দিল। ঔষধের দাম আর যোগাইতে পারিল না। ২০ গ্রেণ কুইনাইন না খাইলে যাহার জ্বর বন্ধ হয় না, সে দশ গ্রেণ কুইনাইন খাইয়াই নিরস্ত হইল।

এইবার আমারও মতি ফিরিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম—যখন এ দেশে কুইনাইন আবিষ্কৃত হয় নাই, তখন কি এদেশের লোকের জ্বর ভাল হইত না? কুইনাইনের মত

জ্বর বন্ধ করিতে পারে, এমন ঔষধ কি রত্নগর্ভা ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী ভারতভূমিতে দুর্ল্লভ? যে দেশে "চরক" "সুশ্রুত" "বাগভট" "হারীতের" গবেষণাময়ী সংহিতা এখনও অতীতের গৌরব ঘোষণা করিতেছে, যে দেশে জ্বরঘ্ন বর্গের মধ্যে—নিম, নিসিন্দা, সেফালী গুলঞ্চ, ক্ষেৎপাপড়া, চিরাতা, ছাতিম, আতিষ, কট্‌কী, পল্‌তা প্রভৃতি—তিক্তগণ ঋষি-প্রতিভার অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ-জগতকে এখনও দেখাইয়া দিতেছে,—সে দেশ কি চিরদিনই কুইনাইনের উপাসনা করিবে?

সহসা নাটার কথা আমার মনে পড়িয়া গেল। পল্লীগ্রামে পথে-ঘাটে-বনে-জঙ্গলে যথেষ্ট নাটার গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। আমি তাহা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলাম। আয়ুর্ব্বেদের কোন্ গ্রন্থে নাটার গুণ বর্ণিত হইয়াছে, কবিরাজ মহাশয়দের নিকট তাহার সন্ধান লইতে লাগিলাম। কিন্তু পরিতাপের বিষয় কোন কবিরাজই আমার আশাপূর্ণ করিতে পারিলেন না। সকলেই মুখে বলেন,——"নাটা জ্বরঘ্ন বটে।" তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ কেহই দেখাইতে পারিলেন না। অনেকেই বলিলেন—"আমরা নাটার গুণ পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই।" হতাশ হইয়া আমি ইংরাজী ভাষায় রচিত মেটিরিয়া মেডিকা অফ ইণ্ডিয়া এবং "ফার্ম্মাকোগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা" নামক গ্রন্থ দ্বয় অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। আমি বিস্মিত হইলাম—কবিরাজ মহাশয়েরা যে নাটার গুণ কেবল পুঁথিগত বিদ্যায় পর্য্যবসিত করিয়া নিশ্চিন্ত, ডিমক ও ক্ষোরি সে নাটার গুণ তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আচার্য্য অক্ষয় চন্দ্র একদিন দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন—"ভারতবাসী ভারত দেখিল না, ভারত বুঝিল না, এত বড় মহাদেশ—তাহার কোথায় কি আছে—তাহার খোঁজ লইল না" তখন আমার সেই আক্ষেপোক্তির চরম সার্থকতা মনে পড়িতে লাগিল।

দরিদ্রের দেশে, দরিদ্রের সমাজে, দরিদ্রের মাঝে বসিয়া আমি নাটার পরীক্ষা আরম্ভ করিলাম। যে রোগীকে কুইনাইন-প্রয়োগের উপযুক্ত দেখিতাম, তাহাকে নাটা খাওয়াইতে লাগিলাম। অল্পদিনের মধ্যেই আমি বুঝিতে পারিলাম—নাটার জ্বর নাশিনী শক্তি অদ্ভুত। নাটার বড়ী—২।৩টী খাইয়াই অনেক রোগীর জ্বর বন্ধ হইতে লাগিল। নাটার আর একটি মহৎ গুণ দেখিলাম—নাটা জ্বরের রিল্যাপ্স বা পুনরাক্রমণ বন্ধ করে। ইহাতে রোগিগণ—অপব্যয়ের হাত এড়াইল, আমার ঔষধের তারিফ করিতে লাগিল। আমারও উপকার হইল—এই মহার্ঘের দুর্দ্দিনে, চড়ার বাজারে, আমি একটী মহৌষধ বিনামূল্যে লাভ করিলাম। নাটা বিনা যত্নে বনে জন্মায়, পয়সা দিয়া কিনিতে হয় না, কেবল একটু পরিশ্রম করিয়া লইয়া আসা এবং তাহা চূর্ণ করিয়া শিশিতে পুরিয়া রাখা। নাটার প্রসাদে আমিও খরচার দায় হইতে মুক্তি পাইলাম।

প্রথমে আমি নাটার ডগা বাটীয়া বটী প্রস্তুত করিতাম, তাহার পর—মূলের ছাল চূর্ণ করিয়া ব্যবহার করিতাম। কিন্তু ইহা বড় অধিক মাত্রায় দিতে হইত, নইলে জ্বর আটকাইত না। রোগীকে অনেকবারও খাইতে হইত। শেষে বীজের চূর্ণ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলাম। দেখিলাম নাটার গুণ ও বীর্য্য তাহার বীজেই অধিক পরিমাণে নিহিত আছে। নাটা বীজের চূর্ণ ১০ গ্রেণ ওজনে একবার মাত্র সেবন করিলে,—সে দিন

জ্বরের বেগ অতি মন্দ হইয়া যায়, পরদিন আর একবার খাইলে জ্বর আর আসে না। তৃতীয় দিন আর নাটা সেবনের আবশ্যকতা নাই।

আমি যে প্রণালীতে নাটা ব্যবহার করিতেছি, পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা লিখিতেছি।

নাটার ফল ঠিক কণ্টকময় বস্ত্ররঞ্জক লটকান ফলের মত। এই ফলের মধ্যে ১টী বা ২টী কখন বা ৩টী পর্য্যন্ত বীজ থাকে। বীজের উপরের আবরণ বড় কঠিন। বীজ গুলি দেখিতে ঠিক কড়ীর মত। উপরের আবরণ মোচন করিলে—ভিতরে শ্বেতবর্ণের শস্য বা শাঁস দেখিতে পাওয়া যায়। এই শাঁস কিঞ্চিৎ তৈলাক্ত। শাঁসগুলি রৌদ্রে দিলে বেশ খটখটে হইয়া যায়, তখন তাহাকে হামান দিস্তায় গুঁড়া করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রে ছাকিয়া লইতে হয়। এই চূর্ণ ৩ ভাগ, পিঁপুল চূর্ণ ১ ভাগ, একত্র মিশাইয়া জল দিয়া মাড়িয়া বড়ী করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া রাখিলে অনেক দিন পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকে। কিন্তু সেরূপ কঠিন বটীকা সেবনকালীন আবার জল দিয়া মাড়িতে হয়। সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা মধু দিয়া মাড়িয়া বড়ী পাকানো। এই বড়ী জল দিয়া গিলিয়া খাইলেই নাটার উপকারিতা দেখিতে পাওয়া যায়।

যে জ্বর কম্প দিয়া আসে, মাথার যন্ত্রণা, পিপাসা, হাত-পা কামড়ানি প্রভৃতি উপসর্গ যে জ্বরে থাকে, অথচ জ্বরের উত্তাপ খুব বেশী হয়, —এইরূপ জ্বরে—বিরাম কালে অথবা জ্বর কমিবার মুখে নাটা ব্যবহার করিতে হইবে। নাটা সেবনের পূর্ব্বে—রোগীকে একটু গরম দুগ্ধ পান করান উচিত, খালি পেটে নাটা সেবনে গা বমি বমি করে। নাটা শিশু-বৃদ্ধ —সকলকেই খাওয়ান চলে। এমন কি উদরাময়, মূর্চ্ছা, গর্ভাবস্থা—সকল অবস্থাতেই নাটা ব্যবহার করা যায়। ইহাতে কোনও বিপদের ভয় নাই। ঘুষঘুষে পিত্ত প্রধান পুরাতন জ্বরেও নাটা অত্যন্ত উপকারী। আমি প্রায় ৪ মাস কাল অনেক রোগীর দেহে নাটা প্রয়োগ করিতেছি, সর্ব্বত্রই নাটা ব্যবহারে উপকার পাইয়াছি। আমি নাটার নিম্নলিখিত গুণাবলীর পরিচয় পাইয়াছি।

১। নাটা—অত্যন্ত জ্বরঘ্ন। একমাত্রা সেবনেই উপকার জানিতে পারা যায়। সদ্যঃই জ্বর বন্ধ করে।

২। নাটা সকলকেই খাওয়ান চলে। উদরাময়, গর্ভাবস্থাতে, নিষিদ্ধ নহে।

৩। নাটা সেবনে জ্বর বন্ধ হইলে প্রায়ই রিলাপ্স হয় না।

৪। নাটা সেবন করিলে মাথা ঘোরা, কান ভোঁ ভোঁ করা - কোন উপসর্গই হয় না।

৫। নাটা ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে—রোগীকে একবার জোলাপ দিতে পারিলে ভাল হয়।

৬। নাটা—নূতন—পুরাতন উভয়বিধ জ্বরেই ব্যবহার্য্য!

৭। নাটার বীজে একটা বুনো গন্ধ আছে, এই গন্ধ নিবারণের জন্য আমি ২।১ ফোঁটা মৌরী বা দারুচিনির তৈল নাটার সহিত ব্যবহার করি।

৮। নাটার আস্বাদ তিক্ত—কিন্তু কুইনাইনের মত বিকট নহে।

৯। নাটা—প্লীহা ও যকৃতের বিকৃতি দূর করে, বিবৃদ্ধির হ্রাস করে। শরীরে নূতন রক্ত কণিকায় উদ্ভব করিয়া থাকে।

১০। নাটা ঘর্ম্ম ও মূত্রের প্রবর্ত্তক। কোষ্ঠগত বায়ু নাশক।

কুইনাইন ভিন্ন ম্যালেরিয়ার ঔষধ নাই—এ ভ্রান্ত ধারণা অনেকেরই আছে। আমার বিশ্বাস—সে শক্তি নাটারই আছে। যাঁহারা ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণের জন্য রোগীকে ক্রমাগত কুইনাইন খাওয়ান, তাঁহাদিগকে আমি ডাক্তার রসের উক্তি পাঠ করিতে বলি।

ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্বিসের খাস গোরা ডাক্তার মেজর রস্ বলিয়াছেন,—"ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক বলিয়া অনেকে কুইনাইন ব্যবহার করে; কিন্তু তাহাতে উল্টা ফল হয়। কুইনাইন খাইলে ম্যালেরিয়া দিন কতক দমনে থাকে বটে, কিন্তু একেবারে যায় না। ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির মত উহা মানুষের শরীর-যন্ত্রে অবস্থান করিতে থাকে।"

ইহার পরও কি আপনারা বলিতে চাহেন—কুইনাইনে ম্যালেরিয়া নষ্ট হয়? আমি স্বয়ং একজন কুইনাইনের গোঁড়া ভক্ত ছিলাম। অনেক রোগীর দেহেই আমি কুইনাইনের ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি! পরে আমার মত্ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। নাটার জ্বরনাশিনী শক্তি দেখিয়া আমি বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়াছি। সেকালের বৃদ্ধদের মুখে শুনিয়াছি—পূর্ব্বে কবিরাজী ঔষধ খাইয়া যাহাদের জ্বর ভাল হইত, ১০।১৫ বৎসরের মধ্যে আর তাহাদের জ্বর হইতে দেখা যাইত না। এখনকার কবিরাজেরা সেরূপ ঔষধ প্রয়োগ করেননা কেন? আগেকার কবিরাজেরা যে নাটার যথেষ্ট ব্যবহার করিতেন, নিম্নলিখিত ছড়াটিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। "সংবাদ প্রভাকরের" পুরাতন ফাইলে আমি এই পদ্যটী দেখিতে পাইয়াছি। যথা,—

"চিরাতা, নাটার ডগা, পল্‌তা, ধনিয়া।
ক্ষেৎপাপড়া, নিমছাল, গুলঞ্চ আনিয়া।
প্রত্যেক জিনিষ ল'বে ভরি পরিমাণে।
তিন সের জলে সিদ্ধ—বিহিত বিধানে।
ছটাকার্দ্ধ মাত্রা—দিনে দুইবার খা'বে।
যেরূপ হউক জ্বর অবশ্যই যাবে॥"

এমন সহজ লভ্য ঔষধটীও লোকে পরীক্ষা করিয়া দেখেন না, ইহাই গভীর পরিতাপের বিষয়।

নাটা সম্বন্ধে আমি আমার পরীক্ষালব্ধ ফলই প্রকাশ করিলাম। আশা করি এ দেশের চিকিৎসকগণ—কুইনাইনের পরিবর্ত্তে এই বিনামূল্যে প্রাপ্ত সামান্য উদ্ভিদের একটু আদর করিবেন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে নাটার কিরূপ গুণ লিখিত হইয়াছে, আমি তাহা অবগত নহি। আমার অনুরোধ—কোনও কবিরাজ মহাশয় নাটার গুণ সাধারণের গোচরীভূত করুন। ইহাতে দেশের অনেক উপকার হইবে, দরিদ্র রোগিগণও বাঁচিয়া যাইবে। এই দুঃসময়ে আমাদের দেশীয় ঔষধ গুলির গুণাগুণ পরীক্ষিত হওয়া উচিত। কত বিদেশী আসিয়া আমাদের দেশের উদ্ভিদের গুণ পরীক্ষা করিয়া তাঁহাদের মতামত সাধারণের উপকারার্থে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, আর আমরা এমনি অলস ও কর্ত্তব্য বিমুখ যে, নিজের হাতের নিধি হেলায় হারাইতে বসিয়াছি! এজন্য আমাদের লজ্জা কি অনুতাপও হয় না। আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা কি চিরদিনই এইরূপে জগতের মাঝে ধিক্কৃত হইবে? আমরা কি আপনার জিনিষ কখনও চিনিবার চেষ্টা করিব না!

আমি অনেকগুলি দেশীয় উদ্ভিদের ক্রিয়া-শক্তি পরীক্ষা করিয়াছি। সুযোগ ও সুবিধা পাইলে একে একে তাহা প্রকাশ করিব।*

ডাক্তার শ্রীক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়
L. M. S.

অতিসার রোগ।

(২)

অতিসারে প্রচুর পরিমাণে মলস্রাব হইতে থাকিলে প্রথমে পাচক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করিতে হয়। শূল ও আধ্মান থাকিলে বিশেষতঃ আমাশয়ে দোষ সঞ্চার অনুভূত হইলে পিঁপুল চূর্ণ ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত জল প্রয়োগ করিয়া বমন করান উচিত। বমনের পর লঙ্ঘন এবং লঙ্ঘনের পর পেয়া পথ্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

উদরে যন্ত্রণা থাকিলে স্বেদ দেওয়া কর্ত্তব্য। গরম জল পূর্ণ বোতল, বস্ত্রখণ্ড বা হস্ত উত্তপ্ত করিয়া স্বেদ দেওয়া যাইতে পারে।

অতিসারে জল প্রয়োগ ;—অতিসার রোগে পিপাসা থাকিলে কলা ও শুঁঠের সহিত অথবা মুতা ও ক্ষেৎ পাঁপড়ার সহিত কিম্বা মুতা ও কলার সহিত জল সিদ্ধ করিয়া প্রয়োগ করিবে। সমভাগে মোট দুই তোলা দ্রব্য লইয়া থেঁতো করিয়া চারি সের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে। দুই তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া সেই জল পানার্থ প্রয়োগ করিবে। ধনে এবং কলার সহিতও এইরূপ নিয়মে জল সিদ্ধ করিয়া প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এইরূপে সিদ্ধ জল প্রয়োগ করিলে তৃষ্ণা ও অতিসার প্রশমিত হইয়া থাকে।

অতিসারে ঔষধ সিদ্ধ পেয়া ;—আয়ুর্ব্বেদে ভিন্ন ভিন্ন রোগে ঔষধ সহ পেয়াদি সিদ্ধ করিয়া প্রয়োগ করিবার বিধি আছে। ঐ সকল ঔষধ সিদ্ধ পেয়া পরম হিতকর এবং একমাত্র আর্য্য চিকিৎসাশাস্ত্রেই উহাদিগের প্রয়োগ দেখা যায়। নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, এক্ষণে এইরূপ পথ্য-প্রয়োগ একরূপ লোপ পাইয়াছে। আধুনিক বিলাসিতার যুগে ঐ সকল পরম হিতকর পথ্যের পুনঃ প্রচলন হওয়া সম্ভব পর বলিয়া মনে হয় না। তথাপি পাঠকগণের অবগতির জন্য এবং যদি কেহ এইরূপ পথ্য সেবন করিতে ইচ্ছা করেন বলিয়া ঐরূপ কতকগুলি পথ্যের বিষয় লিখিত হইতেছে।

এইরূপ পথ্য প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে ক্বাথ করিয়া লইতে হয়। বীর্য্যভেদে ঔষধ দ্রব্য তিন প্রকার। তীক্ষ্ণবীর্য্য—যেমন পিঁপুল,

---

* অমাবস্যা পূর্ণিমা বা একাদশীর সময় যাঁহাদের জ্বর হয়, তাঁহারা ঐ সময়ের ২।১ দিন পূর্ব্ব হইতে নাটা ব্যবহার করিলে তাঁহাদের আর জ্বর হইবে না। ইহাও আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।—লেখক।

মরিচ প্রভৃতি। মধ্যবীর্য্য যেমন বেলছাল, গনিয়ারী ছাল, শোণা ছাল প্রভৃতি। মৃদুবীর্য্য—যেমন আমলকী, কিসমিস প্রভৃতি। পূর্ব্বে তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য দুইতোলা, মধ্যবীর্য্য দ্রব্য চারি তোলা এবং মৃদুবীর্য্য দ্রব্য আটতোলা লইবার বিধি ছিল। কিন্তু এক্ষণে অল্পপ্রাণ মানব গণের এরূপ মাত্রা সহ্য হয় না। পূর্ব্বে এইরূপ মাত্রাও আবার কল্কসাধ্য যবাগূ সম্বন্ধে অর্থাৎ ঔষধ বাটার সহিত পাক করিয়া পেয়াদি প্রস্তুত করার রীতি ছিল। ক্বাথ সাধ্য যবাগূর অর্থাৎ ঔষধের ক্বাথ করিয়া সেই ক্বাথের সহিত যে পেয়াদি পাক করা হয়, তাহার মাত্রা আরও অধিক। কিন্তু এক্ষণে পূর্ব্বে যে কল্ক সাধ্য যবাগূর ঔষধের মাত্রা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই বা তদপেক্ষা কম মাত্রায় ক্বাথ সাধ্য যবাগূ প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার করা উচিত। কল্ক সাধ্য যবাগূর জন্য উহার সিকি মাত্রায় দ্রব্য লওয়া সঙ্গত।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ঔষধ দ্রব্য দুইতোলা, চারি তোলা বা আট তোলা লইয়া চারি সের জলে সিদ্ধ করিয়া দুই সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া লইবে। পরে যে দ্রব্যের যবাগূ প্রস্তুত করিতে হইবে, মণ্ড করিতে হইলে তাহার চতুর্দ্দশ গুণ; পেয়া করিতে হইলে ছয় গুণ এবং বিলেপন করিতে হইলে চার গুণ উক্ত ক্বাথ জলের সহিত পাক করিয়া লইতে হয়। মণ্ড খুব তরল (যেমন জল বার্লি) হয়, পেয়া কিঞ্চিৎ সিটাযুক্ত হয় এবং বিলেপী বহু সিটাযুক্ত এবং যৎসামান্য তরল দ্রব্য সমন্বিত হয়।

শালপানি, বেড়েলা, বেলশুঁঠ ও চাকুলের সহিত পেয়া পাক করিয়া দাড়িমের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া পিত্তশ্লেষ্ম জনিত অতিসার রোগে পথ্য দিবে। ধনে ও শুঁঠের সহিত পেয়া পাক করিয়া বাতশ্লেষ্ম বা অতিসার রোগে প্রয়োগ করিবে। বাতপিত্তজ অতিসারে শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুরের ক্বাথে পেয়া প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে। কফজনিত অতিসারে পিঁপুল, পিঁপুলমুল, চৈ, চিতামুল ও শুঁঠের ক্বাথ সহ পেয়া প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

এক্ষণে আমাতিসারের কয়েকটি ফলপ্রদ ঔষধের বিষয় কথিত হইতেছে।

ধান্যপঞ্চক—ধনে, শুঁঠ, বালা, মুতা ও বেলশুঁঠ—প্রত্যেক দ্রব্য সম পরিমাণে—মোট দুইতোলা লইয়া আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া, আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে, এই ক্বাথ পান করিলে আমদোষ, শূলুনি ও মলের বিবদ্ধতা নষ্ট হয় এবং অগ্নিদীপ্তি হয়।

সমস্ত ক্বাথই এইরূপ নিয়মে প্রস্তুত করিতে হয়, অর্থাৎ দ্রব্য যতই হউক সমভাবে মোট দুইতোলা লইতে হইবে।

একটী দ্রব্য হইলে তাহাই দুইতোলা, দুইটী হইলে একতোলা করিয়া দুইতোলা, চারটী হইলে আধতোলা করিয়া দুইতোলা, আটটী হইলে এক সিকি করিয়া মোট দুই তোলা, এইরূপ নিয়মে দ্রব্য লইতে হয়। পরে উক্ত দ্রব্য উত্তমরূপে ধৌত ও কুট্টিত করিয়া আধসের জল সহ মৃদু জ্বালে সিদ্ধ করিতে হয়। আধ পোয়া শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তাহা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

ধান্যচতুষ্ক—ধনে, মুতা, বালা ও বেল শুঁঠের ক্বাথ পিত্ত প্রধান অতিসারে হিতকর।

পিপুল, শুঁঠ, ধনে, যমানী ও হরীতকীর ক্বাথ কফজ অতিসারে, বালা, মুতা, বেলশুঁঠ, শুঁঠ ও ধনের ক্বাথ পিত্তজ অতিসারে এবং

চাকুলে, গোক্ষুর, বরাহক্রান্তা ও কণ্টকারী বাতজ অতিসারে হিতকর। এই সকল যোগ অগ্নিদীপক ও আম পাচক।

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আতইচ, হিং, বেড়েলা সচল লবণ ও হরীতকী ইহাদের চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় উষ্ণ জল সহ সেবন করিলে প্রবল আমাতিসার প্রশমিত হয়। পিঁপুলমূল, পিঁপুল, গজপিপুল ও চিতামূল চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া কিম্বা সচল লবণ, বচ, মরিচ, পিঁপুল, শুঁঠ, হিং আতইচ ও হরীতকী চূর্ণ উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে শ্লেষ্মজনিত অতিসারের শান্তি হয়। এই সকল চূর্ণ দুই আনা হইতে এক সিকি মাত্রায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

লঙ্ঘন এবং উপরোক্ত ঔষধাদি প্রয়োগ করার পর রোগীকে পূর্ব্ব কথিত ঔষধ সিদ্ধ যবাগূ, বিলেপী, এবং মাংসরস পথ্য দিবে। অতিসারে রোগী ক্ষুধার্ত্ত হইলে লঘু পাক দ্রব্য পথ্য দেওয়া উচিত। কেননা লঘু পথ্য ভোজন দ্বারা অতিসার রোগী শীঘ্রই রুচি, অগ্নি ও বল লাভ করিয়া থাকে।

তক্র চার সের, মরিচ, জীরা ও চিতামূল প্রত্যেকে সমভাগে মোট দুই তোলা কদ বেল ও আমরুল শাক প্রত্যেকে চারি তোলা ও কাঁচা মুগের দাল এক ছটাক একত্র পাক করিয়া দুই সের থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। ইহা আহার এবং ঔষধ—উভয়ের কার্য্যই করিয়া থাকে।

শশক, হরিণ, কুক্কট বটের ও তিতিরের মাংসরস অতিসার রোগীর পক্ষে হিতকর। শিঙ্গি, ছোট মাগুর সর্ব্বপ্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য এবং মৌরলা মৎস্য অতিসার রোগে পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু প্রথম অবস্থায় পূর্ব্ব কথিতরূপে যূষ মাত্র দেওয়া উচিত।

এইরূপ পথ্য ও ঔষধ প্রয়োগের পর অতিসারের পক্ক অবস্থা ঘটিলে স্তম্ভন অর্থাৎ ধারক ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত।

এক সিকি হইতে অর্দ্ধ তোলা ধলআঁকড়ার মূলের ছাল বাটিয়া ঘোলের সহিত সেবন করিলে অতিসার প্রশমিত হয়। কচিবাবলা পাতা এক সিকি হইতে আধতোলা মাত্রায় চালুনী জলের সহিত বাটিয়া সেবন করিলে অতিসার ভাল হয়। বটের ঝুরি এক সিকি বা আধ তোলা চেলুনী জলের সহিত বাটিয়া কিঞ্চিৎ ঘোলের সহিত সেবন করিলে অতিসার প্রশমিত হয়।

কাঁচড়া দাম, জামপাতা, দাড়িমপাতা, পানিফলের পাতা, বেলশুঁঠ, বালা, পাথরকুচি, মুতা ও শুঁঠ সমভাগে দুই তোলা লইয়া ক্বাথ করিয়া সেবন করিলে প্রবল অতিসারের বেগও রুদ্ধ হয়। কুড়চিছাল, ইন্দ্রযব ও মুতার ক্বাথে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে অতিসার ভাল হয়। বেলশুঁঠ ও আমের আটির শাঁসের ক্বাথে চিনি ও মধু মিশাইয়া সেবন করিলে বমি ও অতিসার নষ্ট হয়।

অতিসারে দুগ্ধ প্রয়োগ—অতিসারের প্রথম অবস্থায় দুগ্ধ হিতকর নহে। কিন্তু পক্কাতিসারে এবং পুরাতন অতিসারে দুগ্ধ, অমৃতের ন্যায় হিতকারী। অতিসার রোগে বায়ু ও মল বিবদ্ধতার সহিত অল্পে অল্পে নির্গত হইতে থাকিলে, তৃষ্ণা থাকিলে অথবা রক্ত কি পিত্তের দোষ থাকিলে—দুগ্ধ প্রয়োগ বিশেষ হিতকর। অধিক দিনের অতিসারে যে দোষের শেষ থাকে, তাহা দুগ্ধ পান দ্বারা প্রশমিত হয়। তিন ভাগ জল এবং এক ভাগ দুগ্ধ একত্র

পাক করিয়া দুগ্ধ শেষ থাকিতে নামাইয়া প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

গো দুগ্ধ অপেক্ষা ছাগল দুগ্ধ লঘুপাক এবং ধারক বলিয়া অতিসার রোগে ছাগ দুগ্ধ প্রশস্ত। কিন্তু ছাগদুগ্ধের অভাব ঘটিলে গো দুগ্ধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কুড়িটী মুতা, ছাগ দুগ্ধ এক পোয়া এবং জল তিন পোয়া একত্র পাক করিয়া দুগ্ধ শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেবন করিলে অতিসার রোগ প্রশমিত হয়। এইরূপ নিয়মে বেল শুঁঠের সহিত সিদ্ধ করা দুগ্ধও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অতিসারে ঔষধ ও জল সহ সিদ্ধ দুগ্ধই হিতকর।

অতিসার রোগের অবস্থা ভেদে চিকিৎসা—অতিসার রোগে আমদোষ পরিপাক পাইলেও যে রোগীর মলের বিবদ্ধতা অর্থাৎ আটকে আটকে দাস্ত হওয়া ও পিচ্ছিলতা এবং শূলুনি থাকে, তাহাকে মূলা কি কুলের যুষের সহিত পুঁইশাক, বেতোশাক, ব্রাহ্মীশাক, আমরুল শাক, দধি ও দাড়িম ছাল সিদ্ধ ও স্নেহ সংযুক্ত করিয়া পথ্য দিবে।

অতিসার রোগে মলক্ষয় বশতঃ অত্যন্ত মুখ শোষ হইলে যব, মুগ, মাষকলাই, শালি তণ্ডুল, তিল, কুল, কচি বেল—এই সকল দ্রব্য ধনে, দধি ও দাড়িমের সহিত পাক করিয়া যূষ প্রস্তুত করিবে এবং সেই যূষ, ঘৃত ও তৈলে সাঁতলাইয়া পথ্য দিবে। কিম্বা কচ্ছপের মাংস রস—ঘৃত ও দধি সংযুক্ত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

গুদভ্রংশ (হারিশ মলদ্বার বাহির হওয়া)—অত্যন্ত বেগ দিয়া মল ত্যাগ করিবার কালে অনেক সময় মলদ্বার নির্গত হইয়া পড়ে। সাধারণ গুদভ্রংশ রোগে মলদ্বারে শূকরের চর্ব্বি মাখাইয়া ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিতে হয় এবং গো ফণা নামক বন্ধন দ্বারা মলদ্বারের বহির্নির্গমন পথ রুদ্ধ করিয়া মূষিক মাংসের সেক দিতে হয়। কিন্তু অতিসার প্রশমিত হইবার পর উপরোক্ত চিকিৎসা অবলম্বন করা উচিত।

এইরূপ ক্ষেত্রে শাস্ত্রে অম্ল দ্রব্য সহ সিদ্ধ ঘৃত পান এবং অনুবাসন (স্নেহ বস্তি Enema) প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে। আমরুল শাক, কুল, দধি, কাঁজি, শুঁঠ ও যবক্ষার সহ সিদ্ধ ঘৃত পান করিতে হয়। মলদ্বারে স্নেহ প্রয়োগ (চর্ব্বি মালিষ) ও স্বেদ দিয়া মল দ্বার স্নিগ্ধ ও মৃদু হইলে তুলা দ্বারা ধরিয়া ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিবে।

মল দ্বারের পাক—মলদ্বার পাকিয়া উঠিলে পটোলপত্র ও যষ্টিমধুর ক্বাথ, অথবা বট, অশ্বত্থ, যজ্ঞডুমুর, পাকুড়, বেতস ইহাদের কাথে শর্করা ও মধুমিশ্রিত করিয়া অথবা ইক্ষুরস, ঘৃত, ছাগ দুগ্ধ বা গো দুগ্ধ মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। কিম্বা পূর্ব্বোক্ত বটাদির ছাল বাটিয়া ঘৃত সহ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে বা উহাদের চূর্ণ মলদ্বারে সংলগ্ন করিবে। ইহাতে ধাইফুল ও লোধ চূর্ণও যোগ করা যাইতে পারে। ইহাতে রক্ত নির্গত হইলে ঘৃত বা শত ধৌত ঘৃত মালিষ করিয়া মলদ্বার ও কুঁচকিতে পূর্ব্বোক্ত শীতল কাথ সেচন করিবে।

রক্তাতিসার—পিত্তজঅতিসারে—পিত্ত বর্দ্ধক অনুপান সেবন করিলে পিত্ত অত্যন্ত প্রবল হইয়া রক্তকে দূষিত করে এবং দারুণ রক্তাতিসার তৃষ্ণা, শূল, দাহ ও মলদ্বারের পাক হয়। রক্তাতিসার হইলে—পায়রার মাংসের যূষ ঘৃতে সাঁতলাইয়া এবং চিনি মিশ্রিত করিয়া

পথ্য দিবে। কিম্বা হরিণ বা ছাগের রক্ত ঘৃতে সীতলাইয়া আহার করিতে দিবে। শশক প্রভৃতি শীতবীর্য্য বনচর পশু-পক্ষীর মাংস-রসও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইন্দ্রযবের সহিত সিদ্ধ পেয়া এই রোগে বিশেষ হিতকর।

রক্তাতিসারে অন্ত্র মধ্যে ক্ষত হইয়া থাকে। সুতরাং এই অবস্থায় কঠিন খাদ্য না দিয়া তরল খাদ্য (পেয়াদি) প্রয়োগ করা উচিত। এই অবস্থায় পেয়া, মাংসরস, ছাগ দুগ্ধ, ছানার জল প্রভৃতি সুপথ্য।

আম, জাম ও আমলকী পাতার রস ছাগ দুগ্ধ ও মধু সহ সেবন করিলে রক্তরোধ হয়, বাবলা, কুল, জাম, আম ও অর্জ্জুন—ইহাদের কোন একটি গাছের ছাল—আধ তোলা বা এক তোলা বাটিয়া ছাগদুগ্ধ ও মধুসহ সেবন করিলে রক্তাতিসার ভাল হয়। কাঁটানটের মূল এক সিকি হইতে অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় কিঞ্চিত চেলুনী জলের সহিত বাটিয়া এবং মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে রক্তাতিসার প্রশমিত হয়। কৃষ্ণ তিল এক তোলা এবং চিনি এক তোলা বাটিয়া ছাগ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে সত্বর রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

কুড়চি ছাল, আতইচ বেলশুঁঠ, বালা ও মুতার ক্বাথ—আম ও বেদনা যুক্ত রক্তাতিসার প্রশমিত করে। কুড়চি ছাল এবং দাড়িম বৃক্ষের ছালের ক্বাথ—মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে প্রবল রক্তাতিসার প্রশমিত হয়। কুড়চি ছাল আট তোলা, একসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং দাড়িমের কচি ফল আট তোলা বাটিয়া ঐরূপ নিয়মে ক্বাথ করিয়া লইবে। অনন্তর এই দুই প্রকারে ক্বাথ একত্র করিয়া পাক করিবে এবং একটু ঘন হইলে নামাইয়া লইবে। এই ঔষধ একসিকি হইতে আধ তোলা মাত্রায় তক্রের সহিত সেবন করিলে মৃতপ্রায় রক্তাতিসার রোগীও আরোগ্য লাভ করে।

পুট পাক প্রয়োগ—অধিকদিনের অতিসার রোগে মলের আমাবস্থা দূর হইয়া যদি অগ্নির দীপ্তি হয় এবং বেদনা না থাকে, অথচ নানা বর্ণে মল নিঃসৃত হয়—তাহা হইলে পুট পাক প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

স্নিগ্ধ, ঘন, অথচ কীটাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত নহে—এরূপ কুড়চিছাল লইয়া থেঁতো করিয়া জাম পাতার ঠোঙ্গায় স্থাপিত করিয়া তাহাতে চেলুনীর জল সিঞ্চন করিবে। পরে উক্ত ঠোঙ্গা কুশের দ্বারা জড়াইয়া বহির্ভাগ দুই অঙ্গুলি পুরু করিয়া কর্দ্দম দ্বারা লেপ দিবে। অনন্তর ঘুঁটের আগুনের রাখিয়া পোড়াইবে। পরে মৃত্তিকা রক্তবর্ণ হইলে উহা বাহির করিয়া অভ্যন্তরস্থ কুড়চিছালের রস এক তোলা হইতে দুইতোলা মাত্রায় মধুসহ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অতিসার—বিশেষতঃ রক্তাতিসার প্রশমিত হইয়া থাকে। ইহাকে কুটজ পুটপাক বলে।

কুটজ পুটপাকের ন্যায় শোণা ছালের পুট পাক প্রস্তুত করিলে তাহাকে শোন্যাক পুটপাক বলা যায়। প্রভেদ এই যে, শোণা ছাল কুটিয়া গাম্ভীর পাতার ঠোঙ্গায় রাখিয়া কুশ দ্বারা জড়াইয়া লেপ দিয়া পোড়াইতে হয়। ইহাও অতিসারের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অতিসারে যে সকল যোগ-সুলভ এবং সহজ প্রাপ্য—সেই সকলের বিষয় কথিত হইল। এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রে বহুবিধ যোগের বিষয় লিখিত আছে। অতিসারের অবস্থাভেদে নানা প্রকার বস্তি-প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে। ঔষধ সহ সিদ্ধ

নানাপ্রকার ঘৃতও অতিসারের অবস্থাভেদে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

পুরাতন অতিসারে পথ্য—অতিসার রোগ পুরাতন হইলে এবং অগ্নির দীপ্তি হইলে অন্ন পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। পুরাতন দাদখানি চাউলের সুসিদ্ধ অন্ন এবং কচি কাঁচ কলা ও পূর্ব্ব কথিত মৎস্যের ঝোল সুপথ্য। মাংস-সাত্ম্য রোগীকে পূর্ব্বোক্ত মাংসের যূষ পথ্য দেওয়া পারে। তদ্ব্যতীত ছাগদুগ্ধ ও গোদুগ্ধ কথিত নিয়মে সিদ্ধ করিয়া এবং অবস্থাভেদে দধি, তক্র ও সদ্যোজাত মাখন দেওয়া যায়। কচি বেলপোড়া, দাড়িম, পাকা গাব জল খাবার দেওয়া যাইতে পারে। ক্ষুধা বুঝিয়া এক বেলা অন্ন ও একবেলা পেয়াদি পথ্য দেওয়া উচিত। রোগ সম্পূর্ণ প্রশমিত না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপ নিয়মে পথ্য দিতে হয়। রোগ প্রশমিত হইলেও অতি সাবধানে পথ্যের মাত্রা বাড়ান উচিত। কেননা সহসা অধিক মাত্রায় আহার করিলে অথবা কুপথ্য আহার করিলে, রোগ পুনরাক্রমণ করিতে পারে। অতিসারে অপথ্য—গোধূম, মাষ কলায়, যব, শিম, ওল, সজিনার ফুল বা ডাঁটা, কাঁটাল, কুমড়া, লাউ, কুল, গুরুদ্রব্য, পান, ইক্ষু গুড়, মদ্য, কিসমিস, রশুন, দূষিত জল, নারিকেল, সর্ব্বপ্রকার পত্র শাক, ক্ষার দ্রব্য, লবণ মসলাযুক্ত ব্যঞ্জন, অম্ল রসযুক্ত দ্রব্য, স্নান, তৈলাদি মর্দ্দন স্নিগ্ধ দ্রব্য, ব্যায়াম ও অগ্নি সন্তাপ অতিসার রোগীর পক্ষে অহিতকর।

প্রবাহিকা—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রবাহিকা অতিসার রোগের প্রকার ভেদ মাত্র। অহিতকর আহার হেতু বায়ু কুপিত হইয়া সঞ্চিত মল সহ মুহুর্মুহু অধঃপ্রেরণ করিতে থাকে। এই রোগে মল ত্যাগ কালে অতিরিক্ত প্রবাহন (কোঁতান) করিতে হয় বলিয়া ইহাকে প্রবাহিকা বলে।

প্রবাহিকা রোগে বায়ুর প্রকোপ থাকিলে অত্যন্ত শূলুনি, পিত্ত প্রকোপ থাকিলে দাহ এবং কফ প্রকোপ থাকিলে অত্যন্ত কফ নির্গম হয়। আর রক্তের প্রকোপ থাকিলে মলের সহিত কখন বা মল ব্যতীত রক্ত নির্গত হয়। ইহাই সাধারণতঃ রক্তামাশয় নামে খ্যাত। প্রবাহিকা রোগের অন্যান্য লক্ষণ অতিসারের ন্যায় এবং অতিসারের ন্যায় ইহার আম ও পক্ক অবস্থা নির্ণয় করিতে হয়।

অতিসার রোগের প্রথমাবস্থায় যেরূপ হরীতকী ও পিঁপুল বাটিয়া জোলাপ লইবার কথা বলা হইয়াছে, প্রবাহিকা রোগে রক্তভেদ থাকুক আর নাই থাকুক, সেইরূপ নিয়মে জোলাপ লইতে হয়। ইহাতে রোগী কষ্ট পায় না এবং রোগও সত্বর প্রশমিত হইয়া থাকে।

বিরেচনের পর অতিসার রোগের প্রথমে যে সকল তরল পদার্থ পথ্য দিবার কথা বলা হইয়াছে, প্রবাহিকা রোগেও সেই সকল পথ্য প্রয়োগ করিতে হয়।

প্রবাহিকার ঔষধ—কচি বেলপোড়ার শাঁস দুইতোলা, ইক্ষু গুড় এক তোলা, পিঁপুল চূর্ণ এক আনা, শুঁঠ চূর্ণ এক আনা ও কিঞ্চিৎ তিল তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে প্রবাহিকা রোগ প্রশমিত হয়। ছাগদুগ্ধ আট তোলা এবং মরিচ চূর্ণ দুই আনা বা পিঁপুল চূর্ণ এক সিকি একত্র করিয়া সেবন করিলে মল-বিবদ্ধতা যুক্ত প্রবাহিকা রোগ প্রশমিত হয়। কচি বেলপোড়ার শাঁস এক তোলা, তিলবাটা একতোলা ও দধির সর একতোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে প্রবাহিকা রোগের শান্তি হয়। বেল-

শুঁঠ, মরিচ ও লোধ কাষ্ঠ সমভাগে চূর্ণ করিয়া এক সিকি মাত্রায় তিল তৈলের সহিত লেহন করিলে প্রবাহিকা রোগ প্রশমিত হয়।

ছাগ দুগ্ধ বা গো দুগ্ধের মধ্যে রক্তবর্ণ উত্তপ্ত লৌহ নিক্ষেপ করিয়া সেই দুগ্ধ শীতল হইলে মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে প্রবাহিকা রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। স-সার দধি, মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে প্রবাহিকা রোগ নষ্ট হইয়া থাকে। প্রবাহিকা রোগীর অগ্নি প্রদীপ্ত হইলে অথচ ভালরূপ মল নির্গত না হইয়া ফেণা ফেণা মল নির্গত হইলে মাত গুড়, ১ তোলা, শুঁঠ চূর্ণ দুই আনা, সারযুক্ত দধি দুইতোলা, তিল তৈল আধ তোলা, দুগ্ধ আট তোলা ও ঘৃত আধ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে এই রোগ প্রশমিত হয়।

প্রবাহিকা রোগে যে সকল বস্তি প্রয়োগের উপদেশ আছে, সেগুলি বিশেষ হিতকর। কিন্তু ঐ সকল বস্তি আর এক্ষণে প্রযুক্ত হয় না বলিয়া সে সকলের বিষয় উল্লিখিত হইল না।

প্রবাহিকায় রক্তস্রাব হইতে থাকিলে রক্তাতিসারের কথিত যোগ সকল প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করিবে।

রুক্ষতা বশতঃ অতিসার জন্মিলে স্নিগ্ধ ক্রিয়া এবং স্নিগ্ধতাবশতঃ জন্মিলে রুক্ষ ক্রিয়া করিবে। ভয় ও শোক জন্য অতিসারের প্রথমে সান্ত্বনা বাক্য দ্বারা ভয় ও শোক নাশক বাক্যাদি দ্বারা শোক নাশ করিবে। বিষ, অর্শঃ ও ক্রিমি জনিত অতিসারে ঐ সকল রোগ এবং অতিসার উভয়ের প্রতিকারক চিকিৎসা করিবে। বমন, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে অতিসারের অবিরোধীভাবে তাহাদের চিকিৎসা করিবে।

জ্বরাতিসার—জ্বরাতিসার একটী পৃথক্ রোগ নহে। জ্বর ও অতিসার একই সময়ে এক ব্যক্তির শরীরে উৎপন্ন হইলে তাহাকে জ্বরাতিসার বলা যায়। যদি পিত্তজ্বরে পিত্ত জন্য অতিসার হয় অথবা অতিসার রোগে জ্বর হয়, তবে ঐ মিলিত রোগকে জ্বরাতিসার বলা যায়।

জ্বরাতিসারে বিরুদ্ধ চিকিৎসা আবশ্যক। বৈদ্যগণ জ্বরাতিসারকে কষ্টসাধ্য বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ জ্বরে বিরেচন হিতকর, অথচ বিরেচন অতিসার রোগ বর্দ্ধক। আবার অতিসার রোগে ধারক ঔষধ প্রয়োগ হিতকর, অথচ ধারক ঔষধ জ্বর বর্দ্ধক।

অতিসারের ন্যায় জ্বরাতিসারেও আম ও পক্ক অবস্থা বিবেচনা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। পথ্য প্রয়োগও অতিসারের ন্যায়, তবে যাহাতে পথ্য জ্বরের বিরুদ্ধ না হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

জ্বরাতিসারের নিম্নলিখিত যোগ সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। (১) আকনাদি, ইন্দ্রযব, চিরাতা, মুতা, ক্ষেৎ পাঁপড়া, গুলঞ্চ ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথ জ্বরযুক্ত আমাতিসার নাশক। (২) বেণার মূল, বালা, মুতা, ধনে, বরাহক্রান্তা, ধাইফুল লোধ ও বেলশুঁঠ ইহাদের ক্বাথ জ্বরাতিসার, অরুচি, ও আম দোষ নাশক।

(৩, ৪) ইন্দ্রযব, আতইচ, শুঁঠ, চিতামূল, বালা ও দুরালভার ক্বাথ অথবা ইন্দ্রযব, দেবদারু, কটকী ও গজপিপ্পলীর ক্বাথ সেবন করিলে জ্বরাতিসার ও দাহ প্রশমিত হয়।

(৫) বেণারমূল, বালা, ধনে, মুতা, বেলশুঁঠ, বেড়েলা ও ধাইফুল ইহাদের ক্বাথ রক্ত স্রাব যুক্ত জ্বরাতিসার নাশক। (৬) বালা,

আতইচ, মুতা, বেলশুঁঠ, শুঁঠ, ও ধনের ক্বাথ পান করিলে রক্তস্রাবযুক্ত জ্বরাতিসার প্রশমিত হয়। (৭) গুলঞ্চ, আতইচ, ধনে, শুঁঠ, বেলশুঁঠ, মুতা, বালা, আকনাদি, চিরাতা, কুড়চি ছাল, রক্তচন্দন, বেণার মূল ও পদ্ম কাষ্ঠ ইহাদের ক্বাথ শীতল অবস্থায় পান করিলে জ্বরাতিসার, বমন বেগ, অরুচি, বমি, পিপাসা ও দাহ নষ্ট হয়। অতিসারের ঔষধ সকল বিবেচনা পূর্ব্বক জ্বরাতিসারে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

আরোগ্য লক্ষণ—যাহার অধোবায়ু সম্যকরূপে নির্গত হয়, দাস্ত ব্যতীত প্রস্রাব হয়, অগ্নির দীপ্তি ও কোষ্ঠ লঘু হয়, তাহার রোগ ভাল হইয়াছে জানিবে।

শ্রী—

চক্রপাণির জাতি নাশ।

চক্রপাণি দত্ত—একজন প্রসিদ্ধ বৈদ্যক গ্রন্থ প্রণেতা। তাঁহার সর্ব্বপ্রধান চিকিৎসা গ্রন্থখানি "চক্রদত্ত" নামে বিখ্যাত। বঙ্গের বৈদ্য সমাজে "চক্রদত্তের" অসাধারণ সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক "চক্রদত্তের" মত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ—এ দেশে আর দ্বিতীয় আছে বলিয়া মনে হয়না। চক্রপাণি একজন স্বাধীন-চিন্তাশীল চিকিৎসক ছিলেন। বৌদ্ধ যুগের শেষাবস্থায় যখন আয়ুর্ব্বেদের সর্ব্বনাশ হইয়াছিল,—আয়ুর্ব্বেদের প্রধান অঙ্গ—শল্য-তন্ত্র একরকম উঠিয়া গিয়াছিল, সেই সময় চক্রপাণি—লতাগুল্মের অদ্ভুত বীর্য্য সংযোগে শল্য-তন্ত্রের সকল প্রয়োজন সাধন করিয়াছিলেন; চক্রপাণির এ ঋণ বৈদ্য সমাজ কখনও পরিশোধ করিতে পারিবেনা।

আমি চক্রপাণির জীবনী লিখিতে বসি নাই, তাঁহার চিকিৎসা-গ্রন্থের সমালোচনা করাও আমার উদ্দেশ্য নহে। আমরা চিরদিনই চক্রপাণিকে বৈদ্য বলিয়া জানিতাম, সম্প্রতি একজন কায়স্থ, সেই চির বৈদ্য—চক্রপাণিকে নিজের দলে টানিবার চেষ্টা করিতেছেন। চক্রপাণির জাতি মারা যাইতেছে,—"ভেড়ার শৃঙ্গে" পড়িয়া হীরার ধার ভাঙ্গিতে বসিয়াছে, সেই টুকু জানাইবার জন্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

সকলেই জানেন—আমাদের দেশে এখন জাতীয়তার একটা সাড়া পড়িয়াছে। সকলেই আপনার জাতিকে বড় করিবার চেষ্টা করিতেছে। এক সময় সাম্যের অভিনয় দেখাইবার জন্য অনেক ব্রাহ্মণও "পৈতা" ফেলিয়া ভগবান হইয়া ছিলেন, এখন আবার উপনয়নে অনধিকারী দল, সেই কুড়ানো পৈতা গলায় পরিতে চাহিতেছেন! এ রহস্য মন্দ নহে। আমি এ উন্নয়ন চেষ্টারও নিন্দা করিতেছি না। আমি বলিতে চাই—নিজে উন্নত হইতে চাও, হও, কিন্তু সে জন্য পরের জাতি মারিতে চাও কেন?

বড়কে ছোট কর কেন? কথাটা একটু বিস্তৃত করিয়াই বলি।

"কায়স্থ পত্রিকা" কায়স্থ সমাজের এক খানি মুখপত্র। উহার এখন "নব পর্য্যায়।" ঐ পত্রিকায়—"মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণি দত্তে"র বর্ণ নির্ণয় শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটী নিতান্তই অসার, একজন বৈদ্যকে নিজের স্বজাতি শ্রেণীভুক্ত করা হইতেছে—বোধ হয় এইজন্যই সম্পাদক এই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধ পত্রস্থ করিয়াছেন! চক্রপাণি দত্ত—বৈদ্যই ছিলেন, কিন্তু হইলে কি হয়—তাঁহার উপাধি যে "দত্ত", আর রক্ষা আছে? নিশ্চয়ই চক্রপাণি কায়স্থ ছিলেন! এরূপ যুক্তির বালাই লইয়া মরিতে ইচ্ছা হয়। এইরূপ যুক্তির বলে, সুবর্ণ বণিক, তন্তুবায় প্রভৃতি যে সকল জাতির দত্ত উপাধি আছে—তাহারা সকলেই মহাত্মা চক্রপাণিকে স্বজাতি বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করিতে পারে! যুক্তিটী পাঠক লেখকের কথাতেই শুনুন—

"চক্রদত্ত মধ্যে তিনি যে আত্ম-পরিচয় মূলক শ্লোকটী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাও এত সংক্ষিপ্ত যে, তাহা হইতে প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করা দুঃসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শ্লোকটী এই—

গৌড়াধি নাথ রসবত্যধিকারি পাত্র—
নারায়ণস্য তনয়ঃ সুনয়োঽন্তরঙ্গাৎ।
ভানোরণু প্রথিত লোধ্রবলী কুলীনঃ
শ্রীচক্রপাণিরিহ কর্ত্তৃ পদাধিকারী।

উক্ত শ্লোকের টীকায় প্রসিদ্ধ টীকাকার শিবদাস সেন লিখিয়াছেন—গৌড়াধিনাথো নর পাল দেবঃ, তস্য রসবতী মহানসং তস্যাধিকারী, তথা পাত্র মিতি মন্ত্রী; ঈদৃশো যো নারায়ণস্তস্য তনয়ঃ সুনঃ ইতি নীতিমান্, অন্তরঙ্গাদিতি লব্ধান্তরঙ্গ পদবিকাৎ ভানোরনু নারায়ণস্য তনয় ইতি যোজ্যং, তেন ভানোরনুজ ইত্যর্থঃ। বিদ্যাকুল সম্পন্নো হি ভিষগন্তরঙ্গ ইত্যুচ্যতে। লোধ্রবলী কুলীন ইতি লোধ্রবলী সংজ্ঞকঃ দত্ত কুলোৎপন্নঃ।

"উদ্ধৃত শ্লোক ও টীকাই আমাদের প্রধান অবলম্বন। উহা হইতে জানা যাইতেছে যে, গৌরাধিপতির [নর পাল দেব] নারায়ণ দত্ত নামক মন্ত্রী ছিলেন। তিনি রাজার রন্ধন শালার তত্ত্বাবধান করিতেন। নীতিমান্, লোধ্রবলী ও কুলীন (লোধ্রবলী সংজ্ঞক দত্ত কুলোৎপন্ন) চক্রপাণি দত্ত উক্ত নারায়ণ দত্তের পুত্র ছিলেন। চক্রপাণির জ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম ভানু দত্ত—তিনি রাজার অন্তরঙ্গ (অর্থাৎ বিদ্যা কুল সম্পন্ন ভিষক্) ছিলেন। বলা বাহুল্য, বন্ধনীর মধ্যবর্ত্তী বাক্যগুলি টীকাকারের। তাহা মূলে নাই।

"পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকে (এমন কি টীকায়) যদিও চক্রপাণি দত্ত মহাশয় (কিম্বা তাঁহার টীকাকার শিবদাস সেন) তাঁহার জাতি সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ কোনই পরিচয় প্রদান করেন নাই, তথাপি নিজেকে 'লোধ্রবলী কুলীন' সংজ্ঞায় পরিচিত করায় তাহা হইতেই তাঁহার জাতি-তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। টীকাকার শিবদাস সেন তাহা শত চেষ্টাতেও লোপ করিতে পারেন নাই। আজীবন মিথ্যাকে সত্যরূপে প্রচার করিবার অনর্থক চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকা প্রযুক্ত কায়স্থদ্বেষী শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয়ও গ্রন্থকারের ইঙ্গিত সম্যক প্রণিধান করিতে পারেন নাই। কেবলমাত্র 'দত্ত' উপাধি দেখিয়াই নির্ব্বিচারে তাঁহাকে 'বৈদ্য' সাব্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছেন।

"চক্রপাণি নিজেকে 'লোধ্রবলী কুলীন' বলিয়া পরিচয় প্রদান করায় ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভানু দত্ত (শিব দাস সেনের মতে) "বিদ্যাকুল সম্পন্ন" হওয়ায় চক্রপাণির বংশ যে মহা কুলীন ছিলেন তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে একমাত্র কায়স্থজাতি ব্যতীত অন্য কোন জাতি মধ্যেই দত্ত উপাধিধারী ব্যক্তি (শ্রেষ্ঠ) কুলীন বলিয়া স্বীকৃত হ'ন নাই। বৈদ্য জাতি মধ্যে 'দত্ত' উপাধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ নিকৃষ্ট বলিয়াই পরিগণিত।

* * * *

"অন্য কোন জাতিতে বিশেষতঃ বৈদ্যজাতির মধ্যে 'দত্ত বংশ' কুলীন বলিয়া কখনই গণ্য ছিল না। এরূপ স্থলে চক্রপাণি দত্ত শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করায় তিনি কায়স্থই হইতেছেন। * * শুধু 'কুলীন' শব্দের প্রয়োগ দ্বারাই মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণি দত্তের কায়স্থ জাতির পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, এবং তিনি যে কুলীন শ্রেষ্ঠ কায়স্থ পুরুষোত্তম দত্তের বংশ সম্ভূত ছিলেন তাহাই সূচিত করিয়া দিতেছে। সম্ভবতঃ আধুনিক কালের গঙ্গা স্রোতঃ" প্রভৃতি কুলসংজ্ঞার ন্যায় 'লোধ্রবল' শব্দ তাৎকালিক (পুরুষোত্তম দত্তের) দত্ত কুলের কুলীনত্ব প্রকাশক বিশেষ সংজ্ঞা ছিল। দত্ত কুলের কৌলিন্য লোপের সহিত উক্ত "লোধ্রবলী সংজ্ঞাটিও কুলশাস্ত্র হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন বর্ম্মা।"

এক্ষণে পাঠক মহাশয়! বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছেন—এই সেনবর্ম্মা স্বাক্ষরকারী প্রভাস চন্দ্র—একজন বৈদ্য দ্বেষী বটেন। তাই প্রাচীন পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্নের মত একজন শাস্ত্র-বিশারদকে আক্রমণ করিতে ইনি একটুও সঙ্কুচিত হন নাই। ইহা অবশ্যই নূতন ক্ষাত্র ধর্ম্মের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ। এ সম্বন্ধে আমি একটী কথাও কহিতে চাহিনা।

লেখক প্রকাশ করিয়াছেন—"টীকাকার শিবদাস সেন তাহা শত চেষ্টাতেও লোপ করিতে পারেন নাই।" ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে, চক্রপাণি যে কায়স্থ ছিলেন, শিবদাস সেন কৌশলে তাহা গোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমি বিস্মিত হইতেছি, —লেখকের এ ধারণা কেমন করিয়া হইল? শিবদাস সেনের সময়ে ত "বৈদ্য বড় কি কায়স্থ বড় ?"—এরূপ আন্দোলনের সূত্রপাতও ছিল না। উমেশচন্দ্র কায়স্থ দ্বেষী হইতে পারেন, কিন্তু তাহা নগেন্দ্র নাথ বসুর বৈদ্য বিদ্বেষের পূরোবর্ত্তী নহে। নগেন্দ্র বাবু নিজের স্বজাতিকে বৈদ্যের চেয়ে বড় বলিয়া প্রকাশ করিবার পর, বাধ্য হইয়াই শাস্ত্রজ্ঞানী উমেশচন্দ্র, বৈদ্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। উমেশ বাবুর উপর এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে—লেখক যদি নগেন্দ্র বাবুর বৈদ্য বিদ্বেষের কথাটা একটু ভাবিয়া দেখিতেন, আমরা তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারিতাম। তিনি (অর্থাৎ লেখক) সংস্কৃত ভাষা জানেন না, ইতিহাসের ধার ধারেন না, বৈদ্যের কুলকারিকা বুঝেন না, অথচ সাদা কাগজে কালির অক্ষরে চক্রপাণিকে কায়স্থ লিখিয়া নিজের অজ্ঞতারই পরিচয় দিয়াছেন।

লেখক প্রভাস চন্দ্র সম্ভবতঃ শুনিয়া থাকিবেন—এক সময় এই বঙ্গদেশে বৌদ্ধ-প্রভাব বড় প্রবল হইয়াছিল। দেশের রাজা প্রজা সকলেই বৌদ্ধ হইয়াছিলেন। অনেক ব্রাহ্মণ বৈদ্য, রাজানুজ্ঞায়—সাম্য তন্ত্রের মতে

আভিজাত্যের গর্ব্ব—উপবীত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহার পরই নবীন হিন্দুত্বের অভ্যুত্থান। দেশে তখন বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় নাই। মহারাজ আদিশূরকে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য বঙ্গের বাহির হইতে ব্রাহ্মণ আনাইতে হইয়াছিল। পাল রাজগণ যে বৌদ্ধমতাবলম্বী রাজা ছিলেন, এ কথাও শ্রীমান্ প্রভাসচন্দ্র শুনিয়া থাকিবেন। এই বৌদ্ধ প্রভাব—পূর্ব্ববঙ্গের বহু বৈদ্য-সন্তানকে উপবীত ত্যাগ করাইয়াছিল। বৌদ্ধ-শাসনে যাঁহারা উপবীত ত্যাগ করেন নাই, নিজের জাতির গৌরব বজায় রাখিয়াছিলেন,—তাঁহাদের নাম হইয়াছিল "লোধ্রবলী"। এরূপ ব্যক্তির সমাজ-সম্ভ্রম যথেষ্ট ছিল। এরূপ ব্যক্তিরা যেস্থানে বাস করিতেন, সেই স্থানকে "লোধ্রবল" বলিত। বৈদ্যদের কুলপুস্তকেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় ;—যথা,—

মালঞ্চঃ সেন কুলস্য গুপ্তানাং খণ্ডমেবচ।
লোধ্রবলশ্চ দত্তানাং কুলস্থানং প্রকীর্ত্তিতং॥

বৈদ্য পঞ্জী। ২য় অঃ।

চক্রপাণি, পিতা নারায়ণের নামেরই উল্লেখ করিয়াছেন, পিতামহের নাম লিপিবদ্ধ করেন নাই। 'সেনবর্ম্মা' (?) জোর করিয়া সেই নারায়ণকে পুরুষোত্তমের পুত্র বলেন কোন্ সাহসে ?

সেন বর্ম্মা বোধ হয় এতক্ষণে বুঝিয়াছেন,—"লোধ্রবল" দত্ত উপাধিধারী বৈদ্যদের একটি কুল স্থানের নাম। দত্তোপাধিক যে সকল বৈদ্য উপবীত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সামাজিক সম্মান ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। চক্রপাণি এ শ্রেণীর বৈদ্য ছিলেন না, পাছে তাঁহার দত্তান্ত নাম দেখিয়া কাহারও মনে সে সন্দেহ হয়, সেই আশঙ্কা দূর করিবার জন্যই, তিনি যে লোধ্রবলী কুলীন—এরূপ কথায় "চক্রদত্তের" উপসংহারে—যৎকিঞ্চিৎ আত্ম পরিচয় দিয়াছিলেন। শিবদাস সেন সে পরিচয় ঢাকিবার চেষ্টা করেন নাই। চক্রপাণি যে বৈদ্য ছিলেন—চক্রপাণিশিষ্য হরিশ্চন্দ্র 'ক্রিয়া কৌমুদী' গ্রন্থে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। হরিশ্চন্দ্র তাঁহার গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে শিবকে প্রণাম করিয়া তাহার পরেই চক্রপাণিকে নমস্কার করিয়াছেন—

"অম্বষ্ঠ বংশোদ্ভব চক্রপাণি রাজন্ম পুণ্য
প্রথিতঃ স্বনামা।"

অতএব চক্রপাণি দত্তের জাতি মারিবার চেষ্টা করিয়া "সেন বর্ম্মা" কেবল উপহাসাস্পদই হইয়াছেন। সেনবর্ম্মা নিজেই ভাবিয়া দেখুন—চক্রপাণির "দত্ত উপাধি দেখিয়াই নির্ব্বিচারে তাঁহাকে" তিনি কায়স্থ সাব্যস্ত করিয়াছেন কি না ? গ্রন্থ শেষে চক্রপাণি লিখিয়াছেন—

যঃ সিদ্ধযোগ লিখিতাধিক সিদ্ধ যোগা
নত্রৈব নিক্ষিপতি কেবল মুদ্ধরেদ্বা।
ভট্টত্রয়-ত্রিপথ-বেদ-বিদা জনেন
দত্তঃ পতেৎ সপদি মূদ্ধনি তস্য শাপঃ।

ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্য ভিন্ন এরূপ শপথ কি কায়স্থ কখনও উচ্চারণ করিতে সাহস করে ?

চক্রপাণির বংশ এখনও চৌপীড়া গ্রামে—বর্ত্তমান রহিয়াছে, "সেন বর্ম্মা" সে সন্ধান লইয়াছেন কি ?*

শ্রীরাম সহায় কাব্যতীর্থ বেদান্ত শাস্ত্রী, ভট্টাচার্য্য।

*এরূপ জাতি মারিবার চেষ্টা, ইহাই নূতন নহে। "নব্য ভারত" নামক প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রে কৈলাস চন্দ্র সিংহ, বৈদ্য রাম প্রসাদ সেনকে কায়স্থ বলিয়া প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাম প্রসাদের

'বকে'র গুণ।

—:*:—

সর্দ্দিতে।

বকের ফুল সর্‌ষের তেলে
সর্দ্দি ভাল হয় ভেজে খেলে।

সর্দ্দি-কাশিতে।

বক মূলের ছাল আধ ভরি,
বচ নাও সমান করি—
এক পোয়া জলের এক ছটাক শেষ,
মধু দিয়ে লাগ্‌বে বেশ।
দু' তিন বারে সেবন কর,
সর্দ্দি-কাসিতে উপকার বড়।

জ্বরে।

বকছাল, অনন্তমূল, আধ আধ ভরি,
গোক্ষুর বীজ, হরীতকী সমান করি,
আধসের জলের এক ছটাক শেষ,
বাত-জ্বর এতে হয় বিশেষ।
ওষুধ এটি চাতুর্থক জ্বরেও,
প্রয়োগ কর আর ত্র্যাহিকেও।

চাতুর্থক জ্বরের পরিচয়।

এক দিন হ'য়ে দু' দিন পর
আবার দেখা দেয় জ্বর,
চাতুর্থক জ্বর নাম তাহার,
বকফুল ভাজা খেলে হয় উপকার।

কফ-পিত্তরোগে।

কফ-পিত্ত রোগ যাহার
বক ফুলের মধু উপকার তা'র।

রাতকাণা রোগে।

এক সের গাওয়া ঘৃত নিয়ে
বকের পাতা এক পোয়া-মিশিয়ে দিয়ে,
মৃদু আগুনে পাক কর,
রাতকাণায় খেলে উপকার বড়।

অপস্মারে।

বকের পাতা দুই ভরি,
গোল মরিচ তার সিকি করি,
চোণা দিয়ে বেটে নিয়ে
অপস্মারে দাও নস্য দিয়ে।

বাতরক্তে।

ম'ষের দুধে বকফুলের গুঁড়
ভাল ক'রে মিশাল কর,
তা'র পর তাহার দধি থেকে—
ননিটা দাওগে গলায় মেখে।

দৌহিত্র বংশের বংশধর একজন উকীলের এবং শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের কশাঘাতে কৈলাস চন্দ্রের চৈতন্য হইয়াছিল। আমরা চক্রপাণির পরিচয় জানি, পৃথক প্রবন্ধে তাহা প্রকটিত হইবে। "পুরুষোত্তম দত্ত" কায়স্থ কুলে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। চক্রপাণি যদি তাঁহার পৌত্র হইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অমন বিশ্ব বিখ্যাত পিতামাতার নামোল্লেখ করিতে নিরস্ত হইতেন না।—আং সং।

বাতে।

বক গাছের মূল আর ধুতুরা মূল
সমান ভাগে কর তুল্,
ব্যথা—ফোলায় প্রলেপ দাও
হাতে হাতে যদি সুফল চাও।

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন।

রসায়ন ও বাজীকরণ।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত অংশের পর।)

শাস্ত্রে নানা প্রকার রসায়নের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি বহুব্যয়-সাধ্য এবং বহু উপকরণ সাপেক্ষ। এই-প্রবন্ধে আমরা সেই-সকলের উল্লেখ না করিয়া অনায়াস-লভ্য কতকগুলি ঔষধের উল্লেখ করিতেছি। "হরীতকী" শীর্ষক প্রবন্ধে ঋতু হরীতকী নামক রসায়নের বিষয় লিখিত হইয়াছে বলিয়া এস্থলে তাহার উল্লেখ করা হইল না। সর্ব্বজন পরিচিত চ্যবনপ্রাশও একটী উৎকৃষ্ট রসায়ন।

(১) মণ্ডুকপর্ণীর (থুলকুড়ির রস, (২) দুগ্ধের সহিত যষ্টিমধু চূর্ণ, (৩) মূল ও পুষ্প সহ গুলঞ্চের রস সেবন করিলে আয়ু, বর্ণ, বল, স্বর ও স্মরণ শক্তি বর্দ্ধিত হয়।

অশ্বগন্ধা চূর্ণ পিত্ত প্রধান ধাতুতে দুগ্ধ সহ, বাত-পিত্ত প্রধান ধাতুতে তিল তৈল সহ এবং বায়ু ও কফ প্রধান ধাতুতে উষ্ণ জল সহ সেবন করিলে শরীর পুষ্ট হয়। সহমত একটী হইতে ৪।৫ টী পিঁপুল, ঘৃত ও মধু সহ এক বৎসর কাল সেবন করিলে রসায়ন হয় এবং কাস, শ্বাস গলরোগ, পাণ্ডু, বিষম জ্বর, স্বরভঙ্গ, পীনস, শোথ প্রভৃতি বিবিধ রোগ নষ্ট হয়।

পিপ্পলী বর্দ্ধমান যোগ,—প্রথম দিন তিনটী পিপ্পলী সেবন করিয়া, প্রত্যহ তিনটী করিয়া বৃদ্ধি করিবে, অর্থাৎ প্রথম দিন তিনটী, দ্বিতীয় দিন ছয়টী. তৃতীয় দিন নয়টী, এইরূপ দশ দিন করিতে হইবে। দশ দিনের পর আবার তিনটী করিয়া প্রত্যহ কমাইতে থাকিবে। আবার দশ দিন পরে তিনটী করিয়া বর্দ্ধিত করিয়া, আবার দশ দিন পরে তিনটী করিয়া কমাইবে। এইরূপ নিয়মে এক সহস্র পিঁপুল সেবন করিতে হয়। এই পিপ্পলী-রসায়ন পুষ্টিকর, সুস্বর জনক, আয়ুবর্দ্ধক, প্লীহানাশক, বয়োস্থাপক এবং মেধাজনক। শাস্ত্রে যাহা অধম মাত্রা—তাহাই লিখিত হইল। এই মাত্রায় সহ্য না হইলে, আরও কম মাত্রায় সেবন করা উচিত। বলবান ব্যক্তির পক্ষে পিঁপুল পেষণ করিয়া দুগ্ধের সহিত সেবন করা উচিত, মধ্য-বল ব্যক্তিগণের পক্ষে কাথ-প্রশস্ত এবং হীন বল ব্যক্তিগণের শীত-কষায় করিয়া সেবন করা কর্ত্তব্য। ঔষধ জীর্ণ হইলে ঘৃত ও দুগ্ধ সহ ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন পথ্য করিবে।

(১) লৌহভস্মের সহিত, (২) স্বর্ণভস্মের সহিত, (৩) বচের সহিত, (৪) ঘৃত ও মধুর

সহিত, (৫) বিড়ঙ্গ ও পিপুল চূর্ণের সহিত, (৬) অথবা সৈন্ধব লবণের সহিত একবৎসর কাল ত্রিফলা সেবন করিলে মেধা, স্মৃতি, বল ও পরমায়ু বৃদ্ধি হয় এবং জরা নষ্ট হয়।

পূর্ব্বদিনের আহার জীর্ণ হইলে প্রাতে একটী হরীতকী, মধ্যাহ্ন আহারের পূর্ব্বে দুইটী বহেড়া এবং আহারের পরে চারিটী আমলকী (প্রত্যেকটী) ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে সুস্থ শরীরে একশত বৎসর জীবিত থাকা যায় এবং সহজে জরা আক্রমণ করিতে পারে না। আমলকী ও কৃষ্ণ তিল ভৃঙ্গরাজের (ভীমরাজ) রসে পেষণ করিয়া প্রত্যহ সেবন করিলে কেশ কৃষ্ণবর্ণ, ইন্দ্রিয় নির্ম্মল, শরীর ব্যাধিহীন এবং দীর্ঘ পরমায়ু লাভ হয়।

বৃদ্ধদারকের (বীজতারক) মূল চূর্ণ করিয়া, শতমূলীর রসে আর্দ্র করিয়া, রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। শুষ্ক হইলে পরদিন পুনরায় শতমূলীর রসে মাখিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। ইহাকে ভাবনা দেওয়া বলে। এইরূপ সাত দিন করিয়া সেই ঔষধ সহ্যমত মাত্রায় (দুই আনা হইতে আধতোলা) কিঞ্চিৎ ঘৃত সহ সেবন করিলে বলিপলিত নষ্ট হয় এবং মেধা ও স্মৃতি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

হস্তিকর্ণ পলাশের মূল চূর্ণ, ঘৃত কিংবা মধুর সহিত সেবন করিলে দীর্ঘ আয়ু এবং মেধা লাভ করা যায়। ইহা একটী উৎকৃষ্ট বাজীকরণও বটে।

আমলকী চূর্ণ আট সের—এক সহস্র আমলকীর রসে একুশ বার ভাবনা দিবে। পরে উহার সহিত ঘৃত ৮ আটসের, মধু আটসের, পিপুল চূর্ণ একসের ও চিনি দুই সের মিশ্রিত করিয়া একটী পাত্রে রাখিয়া পাত্রের মুখ রুদ্ধ করিবে। বর্ষারম্ভে উক্ত পাত্র ভস্মরাশির মধ্যে রাখিয়া, শরৎ কালে উদ্ধৃত করিয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় (আধ তোলা হইতে দুই তোলা) সেবন করিলে বল, বর্ণ, মেধা, স্মৃতি, জীবনীশক্তি ও আয়ু বর্দ্ধিত হয়।

বিড়ঙ্গ রসায়ন—বিড়ঙ্গ চূর্ণ, যষ্টিমধু ও শীতল জল কিম্বা মধু ও কিসমিসের ক্বাথ, অথবা মধু ও আমলকীর ক্বাথ কিম্বা গুলঞ্চের ক্বাথের সহিত সেবন করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে ঘৃত সংযুক্ত লবণ-বিহীন মুগের যুষ প্রস্তুত করিয়া তৎসহ যথেষ্ট ঘৃতযুক্ত অন্ন আহার করিবে। ইহাতে অর্শরোগ ও ক্রিমি নষ্ট হয় এবং মেধা ও আয়ু বর্দ্ধিত হয়।

শ্বেত বেড়েলা, পীত বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে, ভুঁইকুমড়া ও শতমূলী—ইহাদের যে কোন একটীর মূল চূর্ণ, দুগ্ধের সহিত পান করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে ঘৃত-দুগ্ধ-প্রধান খাদ্য আহার করিবে। এই ঔষধ পরমায়ু বর্দ্ধক, বলকারক এবং রক্তপিত্ত রোগনাশক। পীত বেড়েলা ও গোরক্ষ চাকুলে জলের সহিত সেবন করা প্রশস্ত। গৃহমধ্যে থাকিয়া এই ঔষধ সেবন করিলে সমধিক ফল লাভ হয়।

শ্বেত সোমরাজী, রৌদ্রে শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া ইক্ষু গুড় মাখিয়া ঘৃতাক্ত কলসের মধ্যে রাখিবে এবং কলসের মুখ রুদ্ধ করিয়া তাহা ধান্য রাশির মধ্যে স্থাপিত করিবে। সাত দিন পরে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সহ্য মত মাত্রায় সেবন করিয়া উষ্ণ জল পান করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে শরীর শীতল জলে ধুইয়া ফেলিবে এবং শালিধান্যের অন্ন দুগ্ধ ও চিনি সংযোগে আহার করিবে। ইহা বল, বর্ণ, স্মৃতি ও পরমায়ু বর্দ্ধক।

কৃষ্ণবর্ণ সোমরাজী চূর্ণ, গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে কুষ্ঠ, পাণ্ডু, ও উদর রোগ নষ্ট হয় এবং বল, স্মৃতি ও পরমায়ু বর্দ্ধিত হয়। এই ঔষধ প্রাতে সূর্য্যের রক্তিমবর্ণ দূর হইলে সেবন করিতে হয় এবং লবণবিহীন আমলকীর যূষের সহিত সংযুক্ত অন্ন পথ্য করিতে হয়।

মণ্ডূক পর্ণী রসায়ন—মণ্ডূক পর্ণীর (থুল-কুড়ির) রস দুগ্ধসহ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে অথবা রস সেবন করিয়া দুগ্ধ পান করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে দুগ্ধ, ঘৃত, তিল এবং যব দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য আহার করিবে। অন্ন (ভাত) পরিত্যাগ করা উচিত। এই ঔষধ সেবন করিলে মেধা ও আয়ু বর্দ্ধিত হয়। কুটী প্রাবেশিক নিয়মে ঔষধ সেবন করিলে অধিক ফল হয়। প্রথমে ২।১ দিন উপবাস করিয়া ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য।

ব্রাহ্মী রসায়ন - অন্নাহার পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মী শাকের রস সহ মত মাত্রায় পান করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে লবণ বিহীন মণ্ড, পেয়াদি দুগ্ধ সহ সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে অত্যন্ত মেধা বৃদ্ধি হয় এবং দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করা যায়।

প্রাতঃকালে ধারোষ্ণ দুগ্ধ বা শীতল জল পান করিলে কাস, শ্বাস, অতিসার, জ্বর, পীড়কা, কুষ্ঠ, কোঠ, মূত্রাঘাত, অর্শঃ, শোথ, গলরোগ, শিরোরোগ, কর্ণরোগ, চক্ষুরোগ, বাত, পিত্ত, কফ ও ক্ষত জনিত রোগ সকল নষ্ট হয় এবং দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করা যায়।

প্রাতঃকালে শীতল জলের নস্য গ্রহণ করিলে ব্যঙ্গ, বলি, পলিত, পীনস, স্বরভঙ্গ ও কাস ভাল হয় এবং শরীর পুষ্ট ও দৃষ্টি শক্তি বর্দ্ধিত হয়।

নিগুণ্ডী কল্প—নিসিন্দা মূলের ছাল চূর্ণ এক সের ও মধু দুই সের একত্র মিশ্রিত করিয়া একটী ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। পরে উক্ত ভাণ্ডের মুখ রুদ্ধ করিয়া একমাস ধান্য রাশির মধ্যে স্থাপিত করিবে। অনন্তর উদ্ধৃত করিয়া তক্র বা গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে বলি-পলিত নষ্ট হয়, বল, বীর্য্য, আয়ু, মেধা ও দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধিত হয় এবং বিবিধ রোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

ভৃঙ্গরাজ চূর্ণ এক ভাগ, তিল অর্দ্ধভাগ এবং আমলকী চূর্ণ অর্দ্ধভাগ—একত্র করিয়া চিনি বা গুড়ের সহিত সেবন করিলে অকাল জরা ও বিবিধ রোগ নষ্ট হয়।

খণ্ডাম্রক—সুপক্ক মিষ্ট আম্রের রস ৬৪ সের, চিনি ৮ সের, গব্য ঘৃত ৪ সের, শুঁঠ চূর্ণ ৩২ তোলা, মরিচ চূর্ণ ৩২ তোলা, পিঁপুল চূর্ণ ১৬ তোলা এবং জল ৮ সের একত্র করিয়া মৃৎ পাত্রে পাক করিবে। যখন হাতায় লাগিবে, এরূপ ঘনীভূত হইলে তখন নামাইয়া তেজপাতা চূর্ণ ৩২ তোলা এবং গেঁটেলা, চিতামূল, ধনে, মুতা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, জায়ফল, তালীশপত্র, দারুচিনি, ছোট এলাচ ও নাগকেশর প্রত্যেকের চূর্ণ আট তোলা প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লইবে। অনন্তর শীতল হইলে ৪ সের মধু মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ একতোলা হইতে দুই তোলা মাত্রায় আহারের পূর্ব্বে সেবন করিলে অর্শঃ, অম্লপিত্ত কাস, শ্বাস, ক্ষয়, মূর্চ্ছা, শূল, বমি, মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি বিবিধ রোগ নষ্ট হয় এবং মেধা ও পরমায়ু বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইহা উৎকৃষ্ট বাজীকরণ।

যষ্টিমধু চূর্ণ, বংশলোচন চূর্ণ, পিঁপুল চূর্ণ, চিনি অথবা মধু ও ঘৃত—ইহার যে কোন

একটীর সহিত ত্রিফলা চূর্ণ সেবন করিলে উৎকৃষ্ট রসায়ন হয়।

লৌহ ভস্ম বা স্বর্ণ ভস্ম, বচের চূর্ণ সহ অথবা ঘৃত ও মধুসহ কিম্বা বিড়ঙ্গ ও পিঁপুল চূর্ণের সহিত এক বৎসর সেবন করিলে জরা নষ্ট হয় এবং মেধা, স্মৃতি, বল ও পরমায়ু বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

রসায়নের পুষ্টিজনক অনেক ঔষধ প্রয়োগে বাজীকরণ এবং বাজীকরণের অনেক ঔষধ প্রয়োগে রসায়ন হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিবেচনা পূর্ব্বক এক অধিকারের ঔষধ অন্য অধিকারে প্রয়োগ করিতে পারেন।

ক্ষয়রোগ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

যক্ষ্মারোগের সাধারণ লক্ষণ—স্কন্ধ ও পার্শ্ব দেশে বেদনা, গাত্র গরম হওয়া ও জ্বালা করা এবং সর্ব্বদা জ্বর থাকা ক্ষয়রোগের সাধারণ লক্ষণ। এই কয়টি উপসর্গ যুগপৎ ঘটিলে ক্ষয় রোগ বলিয়া আশঙ্কা করিবে।

যক্ষ্মার একটি প্রধান উপসর্গ অতিরিক্ত ঘাম হওয়া। অনেকে যক্ষ্মা রোগের নিদানে ইহার উল্লেখ না দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকেন। কিন্তু ক্ষুণ্ণ হইবার কোন কারণ নাই। জ্বর-নিদান অনুসন্ধান করিলেই ইহার মীমাংসা হয়। ক্ষয়রোগে জ্বর হইলে ঘর্ম্ম হইয়া থাকে। ক্ষয় রোগে প্রলেপক নামক জ্বর হয়। প্রলেপক জ্বরের লক্ষণ যথা :—

প্রলিম্পন্নিব গাত্রাণি ঘর্ম্মেণ গৌরবে ন চ।
মন্দ জ্বর বিলেপী চ সশীতঃ স্যাৎ প্রলেপকঃ॥

অর্থাৎ যে জ্বরে শরীর ঘর্ম্ম দ্বারা লিপ্ত ও গুরু হয় এবং শীত লক্ষণ বিশিষ্ট মন্দ মন্দ জ্বর হয় তাহাকে প্রলেপক জ্বর বলে। ক্ষয়রোগে প্রচুর ঘর্ম্ম হয়, ইহা তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ক্ষয়রোগের পূর্ব্বরূপ—ক্ষয়রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রকাশ পায়। কাস, অঙ্গ মর্দ্দ (গাত্র বেদনা), কফ নির্গম, তালুশোষ, বমি, অগ্নিমান্দ্য, মত্ততা, নাসিকা দিয়া জল ও কফস্রাব, শ্বাস, পীনস ও নিদ্রাধিক্য উপসর্গ ঘটে। রোগীর চক্ষু শ্বেত বর্ণ হয় এবং মাংস ভক্ষণ ও স্ত্রী সহবাসে ইচ্ছা হয়। রোগী স্বপ্ন দেখে—কাক, শুক, নীলকণ্ঠ, শকুন—এই সকল পক্ষী এবং বানর ও কাঁক-লাস যেন তাহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, নদী জলশূন্য হইয়াছে, শুষ্ক বৃক্ষ সকল যেন বায়ু ও ধূমে আচ্ছন্ন রহিয়াছে।

রোগ মাত্রেই প্রবল বা মৃদুভাবে প্রকাশ পাইতে পারে। জ্বর বলিতে দুই এক দিনে মারাত্মক জ্বরও বুঝায়, আবার সামান্য-সাধ্য জ্বরও বুঝায়। যক্ষ্মা রোগও সেইরূপ প্রবল বা অপ্রবল ভাবে প্রকাশ পাইতে পারে। রোগের প্রাবল্য বা অল্পতা রোগীর শরীরের অবস্থা ও রোগবীজের উপর নির্ভর করে। প্রবল রোগে হঠাৎ শীত করিয়া জ্বর হয়, কাস,

শ্বাসরুদ্ধ ও পাঁজরার বেদনা উপসর্গ ঘটে এবং উপসর্গ সকল ক্রমে বাড়িতে থাকে। নীলবর্ণ পুযের ন্যায় কফ নির্গত হয়, কখন কখন মুখ দিয়া রক্ত উঠে! ক্রমে পূর্ব্ব কথিত উপসর্গ আসিয়া জোটে।

অপ্রকাশ যক্ষ্মা নানা আকারে প্রকাশ পায়। অনেক স্থলে রোগ এরূপ ভাবে প্রকাশ পায় যে, সহজে ক্ষয়রোগ বলিয়া ধরা পড়ে না। কার্য্যক্ষেত্রে আমরা যত প্রকার দেখিয়াছি, নিম্নে লিখিত হইতেছে।

ঘুষ ঘুষে জ্বর, ঘুষ ঘুষে কাস—এইরূপ আকারে অনেক স্থলে প্রকাশ পায়। রোগী প্রথমে গ্রাহ্যই করে না, বিশেষ বিজ্ঞ চিকিৎসক ব্যতীত সহজে রোগ ধরিতে পারে না। জ্বর ও কাসের চিকিৎসা চলিতে থাকে। কখন কখন হঠাৎ রোগ প্রবল আকারে প্রকাশ পায়, কখন বা ধীরে ধীরে রোগীর দেহ ও প্রাণ ক্ষয় করিতে থাকে। যখন ধরা পড়ে, তখন রক্ষার আর উপায় থাকে না। মুখ দিয়া রক্ত উঠা—কখন কখন হঠাৎ মুখ দিয়া রক্ত উঠে, সঙ্গে সঙ্গে জ্বর বুকে বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ ঘটে। কখন বা একদিন মুখ দিয়া রক্ত উঠে, দীর্ঘকাল পরে আবার একদিন উঠে, কিছুদিন পরে আবার উঠে, শেষে রোগ প্রবল ভাবে প্রকাশ পায়। একবার রক্ত উঠার পর দুই বৎসর রক্ত উঠে নাই, দুই বৎসর পরে রক্ত উঠার পর আবার এক বৎসর উঠে নাই, কিন্তু ছয় মাস পরে রোগ প্রবলভাবে প্রকাশ পাইল এবং রোগী সত্বর মৃত্যুমুখে পতিত হইল—ইহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

স্বপ্নদোষ ও রক্তহীনতা—রোগীর বয়স ১৯।২০ বৎসর, নিত্য স্বপ্নদোষ হয়, শরীর অত্যন্ত রক্তহীন হইয়া পড়িতেছে, ক্ষুধা ও কোষ্ঠশুদ্ধি ভাল হয় না, বিকালে একটু জ্বর ভাব হয়।—কবিরাজ জ্বরের চিকিৎসা করেন, কোন ফল হয় না। ২।৩ মাস পরে অন্য একজন বিজ্ঞ কবিরাজের চিকিৎসায় কিন্তু আরোগ্য লাভ করিল—এমনও দেখা গিয়াছে।

অজীর্ণ ও রক্তহীনতা—রোগীর বয়স ২৭।২৮ বৎসর, আসিয়া বলিল—অজীর্ণ রোগে কষ্ট পাইতেছি, অন্ন ঢেকুর উঠে, বমি হয়। অমুক অমুক দেখিয়াছেন কিছু হয় নাই। অজীর্ণ রোগের যেরূপ অবস্থা এবং যে ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল—তাহাতে উপকার হইবার কথা—তবে হইল না কেন? জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার শরীর কি এইরূপ কৃশ? রোগী বলিল, না মহাশয়, আমি এর ডবল ছিলাম, দেড়মাসে এইরূপ হইয়া গিয়াছি। ক্ষয় রোগ স্থির করিলাম, রোগীর বোধ হয় বিশ্বাস হয় নাই। অন্য চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে ক্ষয়রোগে মৃত্যু হইল—এরূপ কথাও শুনিয়াছি।

স্বরভঙ্গ, গলা বেদনা—রোগী আসিয়া বলিল, কবিরাজ মহাশয়, স্বরভঙ্গ হ'য়েছে, গলায় বড় বেদনা আর সর্ব্বদা সর্দ্দি জ'মে আছে। অমুক অমুক দেখিয়াছে, কোন ফল হয় নাই। দুই সপ্তাহ চিকিৎসা করা হইল, কোন ফল হইল না। তৃতীয় সপ্তাহে রোগী আসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, কখন গরমীর ব্যারাম হ'য়েছিল কি? উত্তর "না।" রোগীর শরীর ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতেছে দেখিয়া ক্ষয়রোগ স্থির করিয়া চিকিৎসা করা হইল, রোগী আরোগ্য লাভ করিল। এরূপ অবস্থাও দেখা গিয়াছে।

পাণ্ডু রোগ, উদরী।—রোগী পরিচিত, নিবাস ইটালিতে ছিল। পাণ্ডুরোগের মত লক্ষণ প্রকাশ পায়। কলিকাতার কয়েকজন সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ, এলোপ্যাথ ও হোমিওপ্যাথ চিকিৎসা করেন। তাঁহারা রোগীর পেটে জল হইবে বা হইয়াছে সন্দেহ করেন। ইঁহাকে কিন্তু গুপ্ত যক্ষা মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বীয় মূর্ত্তি দেখাইয়াছিল

আশ্চর্য্য রোগী।—রোগীর বয়স প্রায় চল্লিশ। মুদিখানার দোকান আছে, বাগানে তরকারী করিয়া বিক্রয় করে। আসিয়া অবস্থা জানাইল, —জ্বর, কাস, মুখ দিয়া রক্ত উঠে, অন্যান্য উপসর্গ আরও ছিল, স্মরণ নাই। ক্ষয়রোগ স্থির করিলাম। রোগী—ম'শায় দু বৎসর হ'ল বিয়ে করেছি বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। দুই সপ্তাহ চিকিৎসার পরে রোগী কোথায় গেল জানিনা। এক বৎসর পরে দেখি, রোগী এক প্রকাণ্ড বজরা মাথায় করিয়া বাজারে চলিয়াছে। কি ব্যাপার, অপ্রবল ক্ষয়রোগ,— না ক্ষয় রোগ নয়, না তাহার নব বিবাহিতা পত্নীর এয়োতের জোর,— এ সমস্যার মীমাংসা হয় নাই।

ম্যালেরিয়ার বেশে যক্ষা।—কখন কখন যক্ষারোগ ম্যালেরিয়ার আকারে প্রকাশ পায়। কিন্তু ইহা প্রায়ই ম্যালেরিয়া-প্রধান-স্থানে হইয়া থাকে, প্রথমে ধরা পড়ে না। ম্যালেরিয়া অপেক্ষা শরীরের অধিকতর ক্ষয় হয় বলিয়া বিজ্ঞ চিকিৎসক কিছুদিন পরে ধরিতে পারেন।

(ক্রমশঃ)

মকরধ্বজের প্রস্তুত প্রণালী।

(২)

আমি যে নিয়মে "মকরধ্বজ" প্রস্তুত করিয়া থাকি, পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে "মকরধ্বজ" সম্বন্ধে আরও দুই একটী কথা বলিব।

অল্প কয়েকদিন পূর্ব্বে আমার এক পৌত্র একখানা ঔষধের তালিকা পুস্তক আনিয়া আমায় দেখায় এবং রহস্য করিয়া আমাকে বলে—"দাদামশায়! তোমাদের মকরধ্বজ প্রস্তুতের সমস্ত বুজরুকী এইবার ধরা পড়িয়া গিয়াছে। এই দেখ—এই পুস্তকে লেখা রহিয়াছে—মকরধ্বজ খুব কম খরচে তৈয়ার হয়। কবিরাজেরা অনর্থক বহুমূল্য লইয়া মকরধ্বজ বিক্রয় করে। মকরধ্বজের ভরি ৪৲ টাকার বেশী হইতে পারে না।"

নাতী আমাকে বইখানা পড়িতে দিয়া চলিয়া গেল। মাধ্যাহ্নিক আহারের পর আমি বেশ অভিনিবিষ্ট হইয়াই বইখানা পড়িয়া ফেলিলাম, পড়িয়া বুঝিলাম—এক ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইয়াও ঔষধের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে, তাহার অপূর্ব্ব মূল্য-নিরূপন পুস্তিকায় সমস্ত কবিরাজের বিরুদ্ধেই এক চাতুরীময় মন্তব্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে! বইখানা পড়িয়া আমার হাসি আসিল। কেননা ঐ ব্যক্তি লিখিয়াছে —"আমি যে গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ

করিলাম, তাহাতে অনেক কবিরাজই আমাদের ঘোরতর বিরোধী ও শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে, এ বিষয় সুনিশ্চিত।" অর্থাৎ এই লোকটীর বিশ্বাস—এ যে তিন টাকায় এক সের চ্যবনপ্রাশ এবং চারি টাকায় একভরি "স্বর্ণঘটিত বিশুদ্ধ আসল মকরধ্বজ" দিতেছে—ইহাতে স্বার্থে আঘাত লাগিবে বলিয়া বঙ্গদেশের সমস্ত কবিরাজ অসন্তুষ্ট হইবেন! কিন্তু সুখের কথা—কোন শিক্ষিত কবিরাজ—এই ঢক্কানিনাদী-বিজ্ঞাপন পড়িয়া,—লোকটীর একটী কথাও প্রতিবাদ যোগ্য মনে করেন নাই। তাঁহারা জানেন—কালই আসল নকলের বিচার করিয়া দিবে। অনাদিকাল হইতে কবিরাজ মহাশয়গণ যে সম্মান উপভোগ করিয়া আসিতেছেন, একজন অজ্ঞাতকুলশীলের ব্যবসাদারী কথায় সে সম্মানের অণুমাত্রও নষ্ট হইবে না।

এই ব্যক্তি কেমন করিয়া "আসল মকরধ্বজ" সস্তায় দিতেছে, তাহার কৈফিয়ৎ দিতে ছাড়ে নাই। পাঠকগণ অগ্রে তাহার কথাগুলা পড়ুন, তাহার পর আমার বক্তব্য আমি বলিব।

"অতি পাতলা স্বর্ণপত্র ১ পল (৮ তোলা) পারদ ৮ পল (৬৪ তোলা) এবং পারদের দ্বিগুণ গন্ধক অর্থাৎ ১৬ পল (১২৮ তোলা) লইয়া একত্র কজ্জলী করিয়া ঘৃত কুমারীর রসে ভাবনা দিয়া সমতল বোতলে পূরিয়া বালুকা যন্ত্রে ৩ দিন পাক করিবে। এবং শীতল হইলে পুষ্পরেণুর ন্যায় লালবর্ণ ঔষধ উঠাইয়া লইবে।"

"পূর্ণমাত্রায় হিসাব দেখাইতে একটু অসুবিধা বলিয়া ৮ ভাগের একভাগের হিসাব দেওয়া গেল।"

"শোধিত স্বর্ণ ১ তোলা ২৫৲ টাকা+হিঙ্গুলোত্থ পারদ ৮ তোলা ৪৲ টাকা+শোধিত আমলাসা গন্ধক ১৬ তোলা ২৲ টাকা+কাষ্ঠ ১৲ টাকা+বোতল বালি, হাড়ী ইত্যাদি ১৲ টাকা+একটী দক্ষ লোকের পারিশ্রমিক ২৲ টাকা মোট ৩৫৲ টাকা। খরচ একটু বেশী করিয়াই ধরা গেল।"

* * * * * *

"স্বর্ণ যদিও মকরধ্বজের গুণ জন্মায় কিন্তু তাহা কখনও মকরধ্বজের সহিত মিশ্রিত হয় না। বোতলের নীচে যে স্বর্ণভস্ম পড়িয়া থাকে, তাহা আয়ুর্ব্বেদোক্ত কোন ঔষধে ব্যবহৃত হইতে পারেনা বটে, কিন্তু সোহাগা দিয়া গালাইয়া পোদ্দার দোকানে বিক্রী করা যায় অথবা তাহা দ্বারা অলঙ্কারাদিও প্রস্তুত হয়। অতএব পূর্ব্ব প্রদর্শিত মোট খরচ ৩৫৲ টাকা হইতে ২৩৲ টাকা বাদ দেওয়া যাইতে পারে। ৩৫৲—২৩=১২৲ টাকায় অন্ততঃ ৭ তোলা মকরধ্বজ প্রস্তুত হয় অর্থাৎ প্রত্যেক তোলা মকরধ্বজে কোন ক্রমেই ২৲ টাকার অধিক খরচ পড়িতে পারেনা।"

সুতরাং এই ব্যক্তির মতে কবিরাজগণ যে ৩২৲।২৪৲।১৬৲।৮৲ টাকা দরে মকরধ্বজ বিক্রয় করেন, ইহা অতিবড় অমানুষিক নৃশংস ব্যাপার!!

আমি স্বয়ং স্বহস্তে মকরধ্বজ প্রস্তুত করিয়া থাকি। মকরধ্বজ পাক সম্বন্ধে আমার যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আছে। সেই অভিজ্ঞতার বলে আমি বড় গলা করিয়া বলিতে পারি—বাপু হে! বৈদ্যের ব্যবসায় ধরিয়া পরিবার পালন করিতেছ, কর, তাহাতে কেহ বাধা দিবেনা, কিন্তু বি এ পাশ করিয়া বিজ্ঞান বিরুদ্ধ কথা বলিতে যাও কেন? নিজের কথাতেই

তুমি যে ধরা পড়িয়াছ। তিন দিন মকরধ্বজে জ্বাল দিতে পারে—এমন "দক্ষ লোকের" পারিশ্রমিক কি ২৲ টাকায় হয়? তুমি কি সত্যযুগের লোক? আমরা ২৫৲ টাকার কম পারিশ্রমিকে ত দক্ষ লোক পাইতেই পারিনা। ৮ ভরি হিঙ্গুলে এক ভরি পারা বাহির হয়—এটা বোধ হয় তোমার জানা আছে। এখন হিঙ্গুলের ভরি ৵০ আনা, এই হিসাবে এক পারার দামই যে ৮৲ টাকা হয়। হিঙ্গুলের দাম বাড়িয়াছে, তোমার মকরধ্বজের দাম তো বাড়ে নাই।

তোমার নিজের কি হিঙ্গুলের খনি আছে? না, "কাশীমপুরের ও ভাওয়ালের গড় এবং টেঙ্গর (পার্ব্বত্য ভূমি) নিকটে থাকাতে"—তোমাকে হিঙ্গুল কিনিতে হয় না? তুমি বোধ হয় হিঙ্গুল "সজীব অবস্থায়" "সকল সময়" "অতি সহজে" ও "সুলভে" মিলাও!

তোমার কামদুঘা দেশে—জ্বালানী কাষ্ঠ একটাকায় ৪ মণ পাওয়া যায়, কিন্তু ৩ দিন মকরধ্বজে জ্বাল দিতে যে ১২ মণেরও বেশী কাঠ লাগে! তোমার দেশের কাঠ কি বৈদিক যুগের অগ্নিমন্থ—অরণি? সে কাঠ কি অতি ধীরে ধীরে পোড়ে?

আমরা মকরধ্বজে যে স্বর্ণ দিয়া থাকি, তাহার ভস্মাবশেষ—ঔষধে প্রয়োগ করিয়া থাকি। তুমি তাহা "সোহাগা দিয়া গালাইয়া" "পোদ্দার দোকানে" বিক্রী কর, অথবা পরিবারের গহনা গড়াও! তোমার হাতের বাহাদুরী আছে। কিন্তু তুমি রসায়ন শাস্ত্রে এমনই অজ্ঞ যে—পারদ ও গন্ধক সংযোগে তিন দিন জ্বাল প্রাপ্ত হইলে স্বর্ণ যে "নিরুত্থ" ভাবে ভস্ম হইয়া যায়, সে জারিত স্বর্ণ যে আর পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে না—এ সহজ বুদ্ধিটুকুও তোমার 'ঘটে' নাই। মকরধ্বজের বোতলের নিম্নদেশে পতিত স্বর্ণ—ঠিক ঝামার মত হইয়া যায়, তাহা আঙুল দিয়া চাপিলে ছাইএর মত চূর্ণ হইয়া যায়। তুমি তো তুমি, স্বয়ং ভরদ্বাজ, অগ্নিবেশ, অত্রি মুনিও সে স্বর্ণ "সোহাগা সংযোগে গালাইয়া"—পূর্ব্বাবস্থায় পরিণত করিতে পারেন না। ধন্য তুমি—সমস্ত বাঙ্গালা দেশটাকে ন্যাকা বুঝাইয়া দিতে চাও! তুমি যখন এত বড় রাসায়নিক—ভস্ম সোণাকেও আসল সোণা করিতে পার—তখন নিশ্চয়ই মুকুন্দ স্থরি রচিত "রস-হৃদয়" গ্রন্থখানা পড়িয়াছ। তিনি কি বলিয়াছেন, একবার পড়িয়া দেখ;—

"রসস্যৈকং দ্বিধা গন্ধং সদ্ধেম রসপাদিকং
মৃণ্মূষাভ্যন্তরে ক্ষিপ্ত্বা পুটেৎত্রিংশদ্বনোপলৈঃ
এবং পুটদ্বয়াৎ স্বর্ণং নিরুত্থং ভস্মজায়তে।

রস-হৃদয়।

অর্থাৎ একভাগ পারদ, দুইভাগ গন্ধকের সহিত, পারদের সিকিভাগ স্বর্ণকে মূষার মধ্যে রাখিয়া ত্রিশখানি বিল ঘুঁটিয়ার দ্বারা পুট দিবে। এইরূপ দুইটী পুটে স্বর্ণ নিরুত্থ ভস্ম হইয়া থাকে। "নিরুত্থং যৎ পুনর্নজীবতি"—ইতি ভাব মিশ্র। ধাতু যেরূপ ভাবে ভস্ম হইলে, আর পুনর্জীবিত অর্থাৎ পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় না,—তাহার নামই নিরুত্থ। ৬০ খানি ঘুঁটিয়ার জ্বালেই যখন স্বর্ণ নিরুত্থ ভস্ম হয়, তখন ৩ দিনের ক্রমাগত জ্বালে কি হয় ভাব দেখি।

রসজ্ঞ পাঠক! বোধ হয় এইবার বুঝিয়াছেন—পারা ও গন্ধক সংযোগে পাচিত স্বর্ণ আর পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় না। এরূপ অসম্ভবকে সম্ভব করিতে যিনি সক্ষম, তিনি মানুষ নহেন, তিনি সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর!

এক্ষণে পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—"তবে ৪৲ টাকায় এক ভরি মকরধ্বজ অন্যে বিক্রয় করে কেমন করিয়া ?"

আমিই উত্তর দিতেছি।

অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন—বরিশাল জেলার কাউগাছী গ্রাম, যশোহর জেলার সিন্দ্রানী গ্রাম এবং পূর্ব্ববঙ্গের অন্য কতকগুলি গ্রাম হইতে—কায়স্থ এবং জুগী জাতীয় ঔষধ বিক্রেতারা মধ্যে মধ্যে ঔষধ বিক্রয় করিবার জন্য দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া থাকে। ইহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে এক একটী টিনের বাক্স—বাক্সটী লালবর্ণের "থেরো" বস্ত্রে মণ্ডিত। এই বাক্সে বিক্রেতা গণ "লৌহ" "তাম্র" "বঙ্গ" "খর্পর" "স্বর্ণবঙ্গ" "রসসিন্দুর" প্রভৃতি ধাত্বৌষধ লইয়া—বৈদ্য-ব্যবসায়ীগণের দ্বারে উপস্থিত হয়। ক্রেতাকে ইহারা ১৲ টাকায় ৮ ভরি "সহস্র পুটিত লৌহ" ১০ ভরি "সহস্র পুটিত অভ্র", ৪ ভরি "বঙ্গ" ও "স্বর্ণবঙ্গ", ১৬ ভরি 'খর্পর' এবং ৪ ভরি "রস সিন্দুর" বিক্রয় করিয়া থাকে। অনেকেই না জানিয়া ইহাদের নিকটে—ধাতুদ্রব্য কিনিয়া থাকেন। কিন্তু ইহারা যে লৌহের পরিবর্ত্তে গেরিমাটী, অভ্রের পরিবর্ত্তে অভ্রচূর্ণ মিশ্রিত-উনানের দগ্ধ মৃত্তিকা, (পাছে কেহ অভ্র বলিয়া বিশ্বাস না করে, সেইজন্য ইহারা কাঁচা অভ্রের বস্ত্র গালিত সূক্ষ্মচূর্ণ—পোড়ামাটীর সহিত মিশায়) বঙ্গের পরিবর্ত্তে হোয়াইট লেড বা রং সফেদা, খর্পরের পরিবর্ত্তে বিলাতীমাটী দিয়া খরিদ্দারগণকে প্রবঞ্চিত করে,—এখন অনেকেই তাহা জানিতে পারিয়াছেন। ইহাদের প্রস্তুত "রস সিন্দুর" অতি উজ্জ্বলবর্ণ, তাহার চটি—দিব্য পরিপাটী, মূল্যও কত সুলভ—একটাকায় ৪ ভরি! এই "রস সিন্দুরই"—শিব কণ্ঠস্থিত সর্পের মত কখনও "আসল স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, কখনও "ষড়গুণ বলিজারিত সিদ্ধ মকরধ্বজ", কখনও বা "স্বর্ণসিন্দুর" নামে—আলমারীর শিশিতে স-গৌরবে শোভা পাইয়া থাকে। এখন পাঠক মহাশয় বিবেচনা করিয়া দেখুন—এক টাকায় ৪ ভরি "মকরধ্বজ" কিনিয়া, তাহার প্রত্যেক তোলা আমি যদি প্রলোভন পূর্ণ বিজ্ঞাপনের সাহায্যে ৪৲ টাকা দরে বিক্রয় করি, তাহা হইলে ১৲ টাকায় আমার ১৫৲ টাকা লাভ হয় কিনা ?

এই সকল "লৌহ-অভ্র-মকরধ্বজ" বিক্রয় কারিগণ—ইহাদের কুলক্রমাগত শিক্ষার ফলে ৩ ঘণ্টায় এক পাক "মকরধ্বজ" প্রস্তুত করিতে পারে। এই "মকরধ্বজ" হিঙ্গুলেরই রূপান্তর মাত্র। সামান্য পারিশ্রমিক পাইলে এবং এক বেলা পেট ভরিয়া খাইতে দিলে—ইহারাই কবিরাজের বাটীতে বসিয়া তথা-কথিত "মকর ধ্বজ' পাক করিয়া দেয়। পারায় জ্বাল দিলে বংশ থাকেনা—যাহাদের মনে এইরূপ ভয় আছে, তাঁহারা ইহাদের দ্বারাই "রস সিন্দুর' ওরফে "মকরধ্বজ" প্রস্তুত করাইয়া লন। রসসিন্দুরকে সুদৃশ্য চাকচিক্যশালী করিবার জন্য ইহারা কজ্জলীর সঙ্গে মনছাল এবং তাম্র চূর্ণ মিশ্রিত করে। ইহাতে চটি বেশ ঝকঝকে এবং পাতলা হয়, কখনও বা ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রিকার মত বিচিত্র বর্ণের আভাও ধারণ করে।

কিন্তু, যাহা প্রকৃত 'মকরধ্বজ', তাহা কখনই অল্প মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে না। আমি ইহার উদাহরণ দিতেছি। ভারতের অদ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক ডাঃ পি,সি রায়, যাহার প্রতিষ্ঠাতা, সেই জগদ্বিখ্যাত বেঙ্গলকেমিকেল ও ফার্ম্মাসিটিকেল ওয়ার্কসে—আজ কাল মকর

ধ্বজ প্রস্তুত হইতেছে, এ মকরধ্বজের কাটতিও খুব, কিন্তু এই ঔষধালয়ের সুবিজ্ঞ কার্য্যাধক্ষ —৪৲ চারি টাকায় ১ ভরি মকরধ্বজ বিক্রয় করেন না। ডাক্তার কার্ত্তিক চন্দ্র বসু এম বি —তাঁহার প্রসিদ্ধ ল্যাবরেটরীতে বিশুদ্ধ "মকরধ্বজ" প্রস্তুত করিতেছেন, তিনিও ১৬৲ টাকা ও ২৪৲ টাকার কমে "মকরধ্বজ" বিক্রয় করেন না। বসুর ল্যাবরেটরীর "মকরধ্বজ"ও লোকে আদর করিয়া কিনিয়া থাকে। বেঙ্গল কেমিকেল এবং বসুর ল্যাবরেটরীতে—এক সপ্তাহ মকরধ্বজের মূল্য ৸৵০ চৌদ্দ আনা। মকরধ্বজ যদি সস্তা দামে বিক্রয় করা সম্ভব হইত, তবে সর্ব্বাগ্রে এই উভয় কারখানার সত্বাধিকারিগণ সস্তায় দিতে পারিতেন।

এইবার "মকরধ্বজের" অনুপানের একটু আলোচনা করা যাউক। পুর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ—যিনি বৈদ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া "চূড়ান্ত সস্তায় ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন," তিনি মকরধ্বজ সেবনের এক অনুপানের তালিকাও ছাপিয়াছেন। নহিলে অনুষ্ঠানের ত্রুটি হইবে যে! পাঠক মহাশয়! একটু নমুনা দেখিবেন কি? যথা ;—

"স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ও বায়ুর জন্য—চাউল ধোয়া জল ও মিশ্রী অথবা মাখন বা দুধের সর এবং মিশ্রী, ত্রিফলা (হরিতকী বহেড়া আমলকী) ভিজানো জল, মিশ্রি অথবা বাদাম কিম্বা বড় এলাচি বাটা মিশ্রী সহ বৈকালে উপযুক্ত মাত্রায় মকরধ্বজ সেবনীয়।"

"পিত্ত রোগে—ধনে মৌরী ভিজান জল মিশ্রী সহ অথবা গুলঞ্চ বা পটোল পাতার রস মধু সহ প্রাতে উপযুক্ত মাত্রায় মকরধ্বজ সেব্য।"

"কফরোগে—আদার রস মধু অথবা আদার রস মিশ্রী সহ কিম্বা তুলসী পাতার রস আদা ও মধুসহ, পানের রস মিশ্রী কিম্বা পিপুল চূর্ণ ও মধু সহ মকরধ্বজ সেব্য।"

"নব জ্বরে—তুলসী পাতার রস, পানের রস আদার রস মধু অথবা পানের রস, সৈন্ধব লবণ (শরীরে বেদনা থাকিলে) বেল পাতার রস ও মধু সহ মকরধ্বজ সেব্য।"

"পুরাতন জ্বরে—সেফালিকা পাতার রস মধু বা গুলঞ্চের রস মধু অথবা চিরতা ভিজান জল মধু সহ সেব্য।"

"প্রমেহ রোগে—কাঁচা হরিদ্রা রস মধু বা কেশুর্ত্তার রস মধু অথবা কাবাব চিনী চূর্ণ মধু কিম্বা গঁদ বা ঈসবগুল ভিজান জল মিশ্রী সহ * * সেব্য।"

"অর্শোরোগে—নাগেশ্বর ফুলের রেণু চূর্ণ এবং মাখন মিশ্রী অথবা গাঁদা ফুলের পাতার রস ও সাফ চিনী সহ কিম্বা যমানী চূর্ণ বিট লবণ ও ঘোল সহ * * সেব্য।"

মকরধ্বজের এইরূপ অনুপানের সুদীর্ঘ তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। অধিক উদ্ধৃত করিব না। এক কথায় ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে,—যে যে মুষ্টিযোগে যে যে রোগ ভাল হয়—ব্যবসায়ী বাবুটীর পুস্তকে তাহা অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে। রসুন বাটা, এরণ্ডমূল, কিছুই বাদ যায় নাই। দুঃখের বিষয়—শাস্ত্রে এরূপ অনুপানে মকরধ্বজ সেবনের ব্যবস্থা আদৌ লিখিত হয় নাই। বাবু যে রোগে যে টোটকার ব্যবহার দেখিয়াছেন তাহাই মকরধ্বজের অনুপান করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমার বক্তব্য—ঐ সকল অনুপান শুধু সেবন করিলেই ত ফল পাওয়া যায়। উহার সঙ্গে "মকরধ্বজ" মিশাইবার প্রয়োজন কি? কাঁচা হলুদের রস মধুসহ সেবনে প্রমেহ রোগ আরোগ্য হয়,—তবে ইহার সঙ্গে মকরধ্বজ প্রয়োগের

সার্থকতা কোথায়? ঘুঁটেরছাই, সিউলী পাতার রসের সহিত সেবন করিলে পুরাতন জ্বর ভাল হইতে পারে। এ আরোগ্য ফল—সিউলী পাতারই প্রাপ্য, ঘুঁটের ছাইয়ের নহে। ইহার দ্বারা ঘুঁটের ছাইএর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা যায় না। অনুপানের অর্থ—ঔষধের সহিত কোনও বিকট বিস্বাদ পদার্থের মিশ্রণ নহে। অনুপান অর্থে পশ্চাৎ পান বুঝায়। ঔষধ সেবন করিয়া মুখ বিকৃত হইলে, সেই বিকৃতি সংশোধনের জন্য যাহা সেবন বা চর্ব্বণ করা যায়—তাহারই নাম "অনুপান"। এই সাদা কথাটা যে বুঝেনা, সে যদি আপনাকে আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ বলিয়া জাহির করিতে চায়, হাসি পায় না কি?

পরিভাষায় বৈদ্যরাজ শ্রীকণ্ঠ বলিয়াছেন—

ভক্ষয়েৎ ভেষজং মুখ্যং জলৈর্বা মধুনা সহ।
ক্ষীরমিক্ষুরসং যূষমনুপানং প্রশস্যতে॥

ধাতুঘটিত মুখ্য ঔষধ জল অথবা মধুর সহিত মাড়িয়া খাইবে। অনন্তর দুগ্ধ, ইক্ষুরস, মুদ্গ বা মসূরাদির যূষ অনুপান করিবে। বলা বাহুল্য মকরধ্বজ একটী মুখ্য ভেষজ—ইহা অকৃত্রিম হইলে কেবল মধু দিয়া মাড়িয়া খাইলেই যথেষ্ট। সেবনান্তে ইচ্ছামত দুগ্ধাদি পান করিতে পার। ইহাই হইতেছে অনুপান। রসুনবাটা, পলতা ছেঁচা, এরণ্ড মূলের রস, প্রভৃতির দ্বারা মকরধ্বজ মাড়িয়া খাওয়া—আয়ুর্ব্বেদ সম্মত নিয়ম নহে। উহার নাম অনুপান নহে, উহা সহপান। তোমরা এইরূপ উৎকট উদ্ভট বিকট স্বরস কল্ক চূর্ণাদি—ঔষধের সহিত মিশাইবার ব্যবস্থা দিয়া, লোকের পক্ষে কবিরাজী ঔষধ সেবন—বিভীষিকাময় করিয়া তুলিয়াছ। তোমাদের মত শাস্ত্রে অনধিকারী অথচ অহঙ্কারে স্ফীত ব্যক্তির সহিত তর্ক করিতেও আমাদের প্রবৃত্তি হয় না।

কত ওজনের মসলা আগুনে চড়াইলে, কতটা মাল উৎপন্ন হইতে পারে, এ জ্ঞানও তোমার নাই। কেননা তুমি যে ৮ ভাগের এক ভাগের হিসাব দিয়াছ, তাহাতে ৭ ভরি মকরধ্বজ উৎপন্ন হইতে পারে না। বিশেষতঃ ৩ দিন পাক করিলে পারা অনেকটা উড়িয়া যায়। এমন কি, সাড়ে তিন ভরি কিম্বা পৌণে চার ভরির বেশী মাল জন্মে না। তুমি নিজে "কাজের কাজী" নহ, কেবল পরের কথায় বিশ্বাস করিয়া হিসাব দিয়াছ! আগে নিজে মানুষ হও, পরে—অপরের কার্য্যের সমালোচনা করিও। নহিলে তোমাকে দেখিয়া বৈদ্য সমাজ "ভূতাপ সরণ" মন্ত্রই পাঠ করিবে।

শ্রীসদানন্দ সেন গুপ্ত।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

বিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষ।—করুণাময় জগদীশ্বরের অপার করুণাবলে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষ পূর্ণ হইয়া আসিল। এইবার এই বিদ্যালয় তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিবে। লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধারের জন্যই এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। বর্ত্তমান সময়ের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের চিকিৎসা যে ভুলিয়া গিয়াছেন, এ কথা

অস্বীকার করিবার যো নাই। যতগুলি কারণে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অবনতি ঘটিয়াছে,—আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক মণ্ডলী অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদে সুশিক্ষিত না হওয়া তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ। এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্টায় ছাত্রগণকে সেই লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষাই যত্নপূর্ব্বক দেওয়া হইতেছে। সুতরাং এই বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ ছাত্রগণ কায়-চিকিৎসার মত কাটাকাড়া, পোয়াতিখালাস প্রভৃতি সকল প্রকার চিকিৎসাতেই কৃতিত্ব লাভ করিয়া আয়ুর্ব্বেদের গৌরব বর্দ্ধনে যে সক্ষম হইবে, সে পক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

বৈদ্যের কর্ত্তব্য।—চিকিৎসা বৃত্তিতে বৈদ্যজাতির যেরূপ গৌরব, এমন আর কিছুতে নাই। রাজা—মহারাজা হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য গৃহস্থ পর্য্যন্ত—সকলকেই চিকিৎসকের বশ্যতা স্বীকার করিতে হয়। পক্ষান্তরে বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাধি লাভে বঞ্চিত হইয়া যাঁহারা জীবিকা নির্ব্বাহের কোন পন্থাই স্থির করিতে পারিতেছেন না, তাঁহাদিগের পক্ষে পাঁচ বৎসর কাল অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষা সমাপ্তি পূর্ব্বক স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বনের,ইহা যে মাহেন্দ্র সুযোগ, সে কথা স্বীকার করিতেই হইবে। চিকিৎসায় সিদ্ধিলাভ করিলে অর্থপ্রাপ্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের চিন্তা তো থাকেই না, তদ্ভিন্ন মিত্রতা, ধর্ম্মসঞ্চয় এবং যশঃ লাভও যে ইহা দ্বারা ঘটিয়া থাকে ইহা সুনিশ্চয়। সেইজন্য আমরা অণ্ডার গ্রাজুয়েট ছাত্রবৃন্দকে—পরামর্শ প্রদান করিতেছি, তাঁহারা সামান্য চাকরির চেষ্টায় সময় নষ্ট না করিয়া এই নূতন সেসন্সের আরব্ধ কালেই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষায় মনোভিনিবেশপূর্ব্বক নিজের জীবিকা নির্ব্বাহের সংস্থান এবং সেই সঙ্গে দেশের-দশের-সমাজের মঙ্গল সাধনে যত্নবান হউন। পরোপকার করিবার এরূপ বৃত্তি জগতে যে আর একটিও নাই।

আয়ুর্ব্বেদের উপর আবগারি।—গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠের "হিতবাদী"তে ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত রাখাল চন্দ্র দত্ত কবিরাজ একখানি পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে প্রকাশ,—

"প্রায় দুইমাস হইল একটি সাহেব Excise Inspector ঢাকা বাবু বাজারস্থিত কবিরাজ শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র কবিরঞ্জন মহাশয়ের একটি রোহিত কারিষ্টের বোতল খরিদ করিয়া কবিরাজ মহাশয়ের সম্মুখেই খুলিয়া লইয়া যান। ইহাতে নাকি Chemical Examinationএ শত করা ১৭ এলকোহল পাওয়া গিয়াছে। সেই উপলক্ষে গত কল্য সন্ধ্যাকালে কবিরাজ মহাশয়কে গ্রেপ্তার করিয়া অদ্য ম্যাজিষ্ট্রেট সমক্ষে উপস্থিত হইবার জন্য জামিন লওয়া হইয়াছে। গতকল্য কবিরাজ মহাশয়ের দোকানের অমৃতারিষ্ট প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অরিষ্টই পুলিশ লইয়া গিয়াছে।"

বিচারে ইহার কি হইল, তাহা এখনও প্রকাশ হয় নাই, সুতরাং সে সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিবনা, তবে কবিরাজী আসব এবং অরিষ্টে যে অ্যালকোহলের বিন্দুমাত্রও পাওয়া যায় না—ইহাতো নিশ্চয় কথা, সেই জন্য ধৃত কবিরাজ মহাশয়ের আসবাদিতে কি করিয়া অ্যালকোহল পাওয়া গেল, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছিনা। মৃত সঞ্জীবনীর মত যে ঔষধ চুঁয়াইয়া প্রস্তুত করা হয়, তাহাতে অ্যালকোহল আছে এবং সেইজন্য সে ঔষধের প্রচলন দেশ হইতে এক রূপ লোপই পাইয়াছে। আসব এবং অরিষ্টকেও যদি সেইশ্রেণীতে ফেলা হয়, তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা করা যে দায় হইয়া উঠিবে। যাহা হউক আমরা এই মকদ্দমার বিচার ফল জানিবার জন্য উৎসুক রহিলাম।

LIBRARY CALCUTTA

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

২য় বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৫—শ্রাবণ। | ১১শ সংখ্যা।

কাজের কথা।

বালক-রক্ষা।—বাঙ্গালীর অকালমৃত্যুর পরিমাণ যত অধিক, পৃথিবীর কোনো দেশে আর এমনটা নাই। ইহার প্রধান কারণ বাঙ্গালীর ব্রহ্মচর্য্যের অভাব। একদিন অবশ্য এমনটা ছিল না, একদিন বাঙ্গালী ব্রহ্মচর্য্য-পালনই ধর্ম্মরক্ষার মূলগ্রন্থি বলিয়া মনে করিত। তাহার ফলে বাঙ্গালী-বালকের গুরু গৃহে অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার ব্যবস্থা হইত। এখন সে পদ্ধতি দেশ হইতে লোপ পাইয়াছে, ফলে চিররুগ্ন-বাঙ্গালীজাতি পরমায়ু থাকিতেও মৃত্যুকে প্রিয় সুহৃদ জ্ঞানে অকালে আলিঙ্গন করিতেছে।

* * * *

ব্যাধির কারণ।—ব্যাধির কারণ যে পাপ-প্রবণতা, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আজি বাঙ্গালীর শতকরা নিরানব্বই জন ডিস্‌পেপসিয়া বা অজীর্ণ রোগগ্রস্থ কেন?—ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে পাপের প্রসার বৃদ্ধিই তাহার কারণ। অজীর্ণরোগে ভুক্ত অন্ন সম্যকরূপে পরিপাক প্রাপ্ত হয় না কেন?—অগ্নির অভাবে। পরিপাক ক্রিয়ার সম্পাদন করাই তো অগ্নির কার্য্য, তবে তাহার ব্যতিক্রমের কারণ কি?—পাপ সঞ্চয়। শুক্ররক্ষা জঠরাগ্নির ক্রিয়া সম্পাদনের মূল। বাঙ্গালী সেই শুক্র রক্ষার অভাবে যে পাপ সঞ্চয় করিতেছে, বাঙ্গালীর অজীর্ণ তাহারই মুখ্যতম কারণ। আজি অজীর্ণ সারাইবার জন্য বাঙ্গালী ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু সে অজীর্ণ সারিবে কেমন করিয়া! আগে শুক্ররক্ষার চেষ্টা কর, তাহার পর রোগ আরোগ্যের চেষ্টা করিও।

* * * *

অকাল মৃত্যু।—শুক্রক্ষয়ই অকাল মৃত্যুর সর্ব্বপ্রধান কারণ। শুক্ররক্ষা করিতে পারিলে, যে সকল সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করে, তাহারা সবল, সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া থাকে। বাঙ্গালী অপেক্ষা অন্যান্য জাতি

এই জন্যই সবল, সুস্থ ও দীর্ঘায়ু। তাহার পর পিতামাতার মনোপ্রবৃত্তির সহিত অপত্য কুলের মনো প্রবৃত্তি স্বভাবতঃই সুসম্বদ্ধ। কাজেই ব্রহ্মচর্য্য বিহীন পিতামাতার বংশধরগণ যে শুক্ররক্ষায় একান্ত উদাসীন হইবে, তাহা তো নিশ্চয় কথা। বালক রক্ষা করিতে হইলে,—সমাজ রক্ষা করিতে হইলে—দেশ রক্ষা করিতে হইলে—আমাদিগকে এ সকল বিষয় বিশেষরূপে চিন্তা করিতে হইবে। প্রত্যেক জনক-জননীকে অপত্যগণের দীর্ঘ জীবন-কামনায় নিষ্কলঙ্ক চরিত্র—আদর্শ পুরুষ-প্রকৃতি হইতে হইবে,—শুধু বচনে চলিবেনা, —কার্য্যতঃ ব্রহ্মচর্য্যরক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বালক-রক্ষার—বাঙ্গালী-রক্ষার ইহা ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই।

* * * *

ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্য।—ছাত্র জীবনে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ একটু চিন্তাশীল হইয়াছেন জানিয়া আমরা সুখী হইয়াছি, কিন্তু এ শিক্ষাটা অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের মত একান্ত প্রয়োজনীয় হইবে না। আমাদের মনে হয় এ শিক্ষাটাও অন্যান্য শিক্ষার মত একান্ত প্রয়োজনীয় হইলে মন্দ হইত না। আমাদের দেশের বালকগণ অধঃপতনের পথ কিরূপ পরিষ্কার করিতেছে, রেলে-ষ্টীমারে এবং কলিকাতার সৌধগুলির দেওয়ালগুলি লক্ষ্য করিলেই তাহার যাথার্থ্য নির্ণীত হইতে পারে। বালকগণের পাপাশক্তির আবেশ উচ্ছাস যখন প্রবল হইয়া পড়ে, তখনই এই সকল স্থলে কুৎসিত কথা লিখিয়া তাহাদিগের শিরিষ-কুসুম-সুকোমল-হস্ত কলুষিত করিতে তাহারা কুণ্ঠিত হয় না। দেশের-চিন্তাশীলগণ এ সকল বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন কি? এই সকল বিভৎস ব্যাপার যখনই আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া থাকে, তখনই আমরা দেশের অধঃপতন কতটা গড়াইয়াছে, বুঝিতে পারি,—বুঝিয়া মর্ম্মাহত হই; কিন্তু প্রতীকার করিবার উপায় আমাদের ক্ষমতা-বহির্ভূত।

* * * *

প্রতীকারের উপায়।—প্রতীকারের উপায় কিন্তু আছে, তবে সে উপায়টার জন্য আমাদিগকে রাজকীয় শাসনের শরণ গ্রহণ করিতে হইবে। প্রাসাদের দেওয়ালে হউক, রেল গাড়ীতে বা ষ্টীমারে হউক—কেহ ঐরূপ লিখিতেছে দেখিলেই, আগে আইনের বন্ধন আঁটিবার ব্যবস্থা করিয়া, পুলিশ কর্ম্মচারীর হস্তে তাহাদিগকে অর্পণ করিতে হইবে। যদি এইরূপ ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে এরূপ কুৎসিত লেখার চলনটা হাটে-ঘাটে আর দেখিতে পাওয়া যাইবে না। এরূপ লেখার ফলে—যাহারা ঐরূপ লিখিয়া থাকে —শুধু তাহাদেরই যে অবনতি ঘটিতেছে তাহা নহে, এরূপ লেখা পাঠ করিয়া অনেক চরিত্র বান-বালকও চরিত্রহীনতার পথে উপস্থিত হইবার সুযোগ পাইতেছে। বাস্তবিকই আমরা যখন রেল বা ষ্টিমার যোগে গমন করি, তখন আমাদের সহিত আমাদের সন্তান-সন্ততি বা ঐ শ্রেণীর কেহ থাকিলে, লজ্জায়—ঘৃণায় অধোবদন হইয়া থাকি। ইহার প্রতীকারের জন্য কর্ত্তৃপক্ষগণের যে হস্তক্ষেপ করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন।

হোমিওপ্যাথি—আয়ুর্ব্বেদ সমুদ্রের একটী তরঙ্গ।

—— :০: ——

বর্ষকাল পূর্ব্বে, এই "আয়ুর্ব্বেদেরই" অবতরণিকায় আমরা লিখিয়াছিলাম—"আয়ুর্ব্বেদ একটী মহা সমুদ্র, অ্যালোপ্যাথি, হোমওপ্যাথি, হাইড্রোপ্যাথি, টিস্যুরেমিডি, হাকিমী—সেই মহা সমুদ্রের এক একটী তরঙ্গ।" আজ আবার সেই কথার পুনরুক্তি করিতেছি।

আমেরিকার অদ্বিতীয় হোমিওপ্যাথ, ডাক্তার ন্যাশ্—তাঁহার অসাধারণ অভিজ্ঞতা ও কর্ম্মক্ষেত্রের যুক্তিময়ী গবেষণা—একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ঐ পুস্তক খানির নাম—How to take the case. সম্প্রতি ঐ পুস্তকের এক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। বন্ধুবর ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্—এই পুস্তকখানি আমাদিগকে পড়িতে দিয়াছেন। গ্রন্থের বিশেষত্ব—গ্রন্থকার প্রকৃত সাধকের ন্যায় হোমিওপ্যাথির বিজ্ঞান-বৈচিত্র্যকে মহত্তর করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার অপূর্ব্ব লিপি-কৌশলে, মহা প্রলয়ের নিরালোক শূন্যতা—অভয়হস্তের সেবা-সান্ত্বনায় ভরিয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ে আমরা এক ত্যাগশীল তপস্বীর উদার হৃদয়ের পূর্ণ পরিচয় পাইয়াছি।

এখন বাঙ্গালার ঘরে ঘরে—"পল্‌সেটিলা-নক্স-সম্বলিত বক্স!" অনেকের ধারণা—হোমিওপ্যাথি ঔষধে উপকার না হইলেও অপকার হয় না। এইরূপ হোমিওপ্যাথকে সম্বোধন করিয়া ডাক্তার বলিতেছেন—"উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগে শরীর হইতে যেমন উৎকট ব্যাধি দূরীভূত হয়, তেমনি অনুপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগে নূতন ব্যাধির সৃষ্টি হয়। সুস্থের প্রাণ বিনাশ করিবার ক্ষমতা যদি আমাদের ঔষধের না থাকে, তবে অসুস্থকে আরোগ্য করিবার ক্ষমতাও তাহার নাই।" কেমন সরল সুন্দর সত্য কথা! গ্রন্থকার আরও বলিয়াছেন—"একখানা তীক্ষ্ণ ধার ক্ষুর ব্যবহারে যেরূপ বিপদের সম্ভাবনা, ঔষধের অনুপযুক্ত ব্যবহারেও তদ্রূপ বিপদের সম্ভাবনা। * * এই সকল ঔষধ দ্বারা যেরূপ মহা উপকার সাধন করা যাইতে পারে, তদ্রূপ মহা অনিষ্টও করা যাইতে পারে।"

যাঁহারা বলেন হোমিওপ্যাথি ঔষধে উপকার না হইলেও কোন অপকার হয় না;—আশা করি আস্ফালন করিবার পূর্ব্বে, তাঁহারা ডাক্তার ন্যাশের কথাটা একবার ভাবিয়া দেখিবেন। যাঁহারা হোমিওপ্যাথি-বিজ্ঞানের রহস্য বুঝেন না, তাঁহারা হোমিওপ্যাথি ঔষধের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য যে সকল কৌশল অবলম্বন করেন, পূর্ব্বোক্ত মন্তব্যটী (অর্থাৎ হোমিও ঔষধের দ্বারা অপকার হয় না) তাহার অন্যতম। এইরূপ যুক্তিহীন মতবাদীগণকে আমরা মহাত্মা কেণ্ট ও ডাক্তার ন্যাশের উপদেশ অনুধাবন করিতে পরামর্শ দিতেছি।

ডাক্তার ন্যাশ হোমিওপ্যাথিকে বড় করিবার জন্য আর একটী কথা বলিয়াছেন। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

"হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে কোনও রোগী নীরোগ হয়ও নাই,

হইবেও না। কারণ এই চিকিৎসা ভিন্ন রোগের সমূল উৎপাটন করিবার আর অন্য পন্থা নাই।" একথাটা অবশ্যই ন্যাশ সাহেব অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন; আমরা কিন্তু হোমিপপ্যাথির এই দাবীটুকু সমূলক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। ডাক্তার ন্যাশ যদি মনোযোগ দিয়া ভারতের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র পাঠ করিতেন, আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি—নিশ্চয়ই তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন ঘটিত। কেননা আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধগুলি রোগীর নির্গদ-রূপে ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ কর্ত্তৃক পরিকল্পিত হইয়াছিল। তাহা শিশ্নোদর-পরায়ণ-মানব মস্তিষ্কের বৈজ্ঞানিক বুদ্বুদ নহে। আয়ুর্ব্বেদের যুক্তি ব্যাপাশ্রয় চিকিৎসা, আজ যাহাকে "হয়" বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, কাল তাহাকে "নয়" বলিয়া বিসর্জ্জন দিতে পারে নাই। বিশেষতঃ আয়ুর্ব্বেদ বেত্তাগণ—যেরূপ অমানুষিক প্রতিভাবলে ব্যাধির স্বরূপ নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন,—সেরূপ প্রতিভা স্বল্পজীবী কলির মানবে বিকশিত হইতে পারে না। তবে ইহাও নিশ্চয়—আমরা সে লোকাতীত জ্ঞানের যথার্থ উত্তরাধিকারী নহি।

ডাক্তার ন্যাশ যে হোমিওপ্যাথির একনিষ্ঠ সাধক, সেই হোমিওপ্যাথিও—ভারতের আয়ুর্ব্বেদের অঙ্গীভূত। আয়ুর্ব্বেদ সমুদ্র, হোমিওপ্যাথি তাহার একটী তরঙ্গ মাত্র। এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে আমরা তাহা দেখাইয়া দিব।

জগতে সকল শক্তির ন্যায় জীবনী শক্তিরও বিকাশের পথ ব্যোমিক বিস্ফুরণের ভিতর দিয়া। প্রণব—এই বিস্ফুরণের সঙ্কেত। তুমি, আমি, বৃক্ষ, লতা, বিশ্বের যাহা কিছু সর্ব্বস্ব—সমস্তই ওঁকার বা আদিম বিস্ফুরণের প্রসব। তোমার আমার দৈহিক পরমাণুপুঞ্জ নিয়তই বিস্ফুরণশীল। য়ুরোপের বিজ্ঞানে ইহারই নাম "অ্যামিবিক মুভমেণ্ট।" যে কোন কারণেই হউক—এই আনবিক স্ফুরণের সাম্যাবস্থা নষ্ট হইলে তাহাকে বিকার বা রোগ বলে। আত্মজ্ঞ জীবনী শক্তি—পুরুষ-শরীরের সর্ব্বত্র ব্যাপী, শরীরের সূক্ষ্ম (অনু ধাতু) উপাদানের উপর আদেশ চালাইয়া—এই পুরুষই আপনার ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা অভিব্যক্ত করেন। ঋষিকল্প বৈজ্ঞানিক হানিমান বলিয়াছেন—

When a person falls ill, it is only this spiritual self acting vital force, every where Present in the organism, that is Primurily deranged by the dynamic influence of a morbific agent inmical to life or genon. বিজ্ঞান যেখানে সত্য প্রচার করিতেছে সেখানে হারীত ও হানিমানে প্রভেদ কোথায়?

ধন্বন্তরি কল্প বাগভট একজন পাকা বৈজ্ঞানিক ছিলেন। বাগ্‌ভট বলিয়াছেন—"লক্ষণ ভিন্ন ব্যাধির স্বরূপ মানুষে জানিতে পারে না।" পঞ্চ-তন্মাত্র স্পৃষ্টা প্রকৃতি দ্রৌপদীকে বিবসনা করিয়া, তাহার স্বরূপ দেখিবার শক্তি কাহার আছে? বিপর্য্যস্ত প্রকৃতির আর্ত্তস্বরের নামই ব্যাধি; প্রকৃতি যখন প্রকৃতস্থা হইবার জন্য মানবের সাহায্য প্রার্থনা করেন, তখন তিনি নিজের অভাব অভ্রান্ত রূপেই ব্যক্ত করিয়া থাকেন। শবচ্ছেদের প্রয়োজন নাই, শারীর তত্ত্ব নিরূপণের জন্য নর-বলি অনাবশ্যক; লক্ষণই সব। সম্পূর্ণ লক্ষণে সম্পূর্ণ রোগ ধরা পড়ে।

কার্য্যও কারণ একই পদার্থ।" এই বাগ্‌ভটের যুগেই পৃথিবীতে প্রথম লাক্ষণিক চিকিৎসার আবির্ভাব হইয়াছিল। এই মহাকথাই, বহু শতাব্দি পরে, মহাত্মা হ্যানিমানের কর্ণে প্রতিধ্বনি তুলিয়াছিল।

আয়ুর্ব্বেদের "সদৃশ সূত্র" যাহা, য়ুরোপের হোমিওপ্যাথিও তাহা। এই সদৃশ-সূত্রের ভিত্তির উপর—হ্যানিমান যে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন, একথা অস্বীকার করা চলে না। "সমঃ সমং শময়তি" এই সদৃশ সূত্রের ইংরাজী অনুবাদ—Similia Similibus carantur. সদৃশ চিকিৎসার মুখ্য উপদেশ—"রোগের সমস্ত লক্ষণগুলি সম্পূর্ণরূপে না জানিলে চিকিৎসক তাহার প্রতিকার করিতে পারেন না। অতএব রোগমাদৌ পরীক্ষেতঃ ততোহনন্তর মৌষধং। ততঃ কর্ম্ম ভিষক্ পশ্চাৎ জ্ঞান পূর্ব্বং সমাচরেৎ।"

আয়ুর্ব্বেদের সদৃশ-সূত্র যে কি গবেষণা-ময় —এক কথায় তাহা বুঝান যায় না। এই মতে চিকিৎসা করিতে গেলে চিকিৎসককে রোগের অবস্থান স্থান," অনুভূতি "উপচয়" "অপচয়" "কারণ [বিপ্রকৃষ্ট, সন্নিকৃষ্ট] ধাতু" "প্রকৃতি" 'পূর্ব্বরূপ" „লক্ষণ" বিশেষ লক্ষণ সাত্ম প্রভৃতি সকল তত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে হইবে। উপাদানের বিশ্লেষণ করিয়া নিপুণ হস্তে ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে। হোমিওপ্যাথির Location, sensasion, modality, causes, constitution and temperement প্রভৃতির সহিত আয়ুর্ব্বেদের সদৃশ সূত্রের রীতি-মত ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাতঃকালে শিশির পড়ে, মধ্যাহ্নে তাপ বৃদ্ধি হয়, সন্ধ্যায় বায়ু বলবান হইয়া উঠে। বাল্যে শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হয়, যৌবনে পিত্ত, বার্দ্ধক্যে বায়ু—কালের ধর্ম্ম শারীর মানস ও জড় ভেদে ত্রিজগতেই এক, এই ত্রিতত্ত্বের একীকরণ—আয়ুর্ব্বেদের বিশেষত্ব। ইহা হইতেই রোগের উপচয় উপশমের কারণ বুঝিতে পারা যায়। বহু যুগ পূর্ব্বে ভারতের ঋষি এ তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। হিন্দু সন্তান এ সকল তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়াছে, তাই সে অন্যের মুখের একটা কথা শুনিলে বিস্ময়-মুগ্ধ হইয়া পড়ে। অতীতের প্রতি অশ্রদ্ধা—তাহাকে আত্মহারা করিয়াছে। বিপুলায়তন ভারতে যে জিনিষ অতি পুরাতন, তাহাকেই সে অপরের আবিষ্কার মনে করে।

আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি—আয়ুর্ব্বেদই জগতের একমাত্র আয়ুর্ব্বেদ ছিল। বেদ—অনন্তকাল ব্যাপী, "আয়ুর্ব্বেদও সেই বেদ,—সকল রূপ চিকিৎসা তত্ত্বই আয়ুর্ব্বেদের ভিতর নিহিত রহিয়াছে। এখন আয়ুর্ব্বেদের অবনতির যুগ, তথাপি সমগ্র চিকিৎসার মৌলিক তত্ত্বগুলি আজিও আয়ুর্ব্বেদ-সূত্রের উপর স্থাপিত। খৃষ্ট-ধর্ম্ম—যেমন বৌদ্ধ ধর্ম্মের অনুবাদ, জগতের চিকিৎসা গ্রন্থ তেমনি আয়ুর্ব্বেদের প্রভা-পুষ্ট। জীবের দেহ ধাতু সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন-শীল—স্বতঃই ক্ষয়-প্রবণ, "তোমরা ধাতুর সেই সাত্ম দিয়া ক্ষয় পূরণ কর —তোমাদের দেশ হইতে অকাল মৃত্যু অকাল বার্দ্ধক্য, অস্বাভাবিক রোগ শোক, বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।"—ভারতের উদার-বিজ্ঞানের ইহাই একমাত্র উপদেশ। আয়ুর্ব্বেদে যে তত্ত্ব নাই, সে তত্ত্ব জগতের কোথাও নাই। চরকের উক্তির চরম সার্থকতা—

"যন্নেহাস্তি নতৎ ক্বচিৎ!"

তাই বলিতেছিলাম—আয়ুর্ব্বেদে যাহা নাই, —হোমিওপ্যাথি তাহা কোথায় পাইবে? হোমিওপ্যাথির ঔষধ-নির্ব্বাচনে আয়ুর্ব্বেদের

সেই দ্রব্যের বীর্য্য ও শক্তি-রহস্যই পরিস্ফুট, হোমিওপ্যাথেরা অল্প মাত্রায় ঔষধ ব্যবহার করেন। আয়ুর্ব্বেদও তীক্ষ্ণ ঔষধের সূক্ষ্ম মাত্রার নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। আপনারা মান পরিভাষার উপক্রমণিকা পড়িলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। যথা ;—

জ্বালান্তর গতৈঃ সূর্য্য করৈ ধ্বংসী বিলোক্যতে।
ষড়্ধ্বংসীভির্মরীচিঃ স্যাৎ তাভিঃ ষড়্ভিশ্চ রাজিকা॥"

কালিঙ্গ মানং।

[পরিভাষা প্রদীপ]

ত্র্যস রেণুস্তু বিজ্ঞেয় স্ত্রিংশতা পরমাণুভিঃ।
ত্র্যস রেণুস্তু পর্য্যায় নাম্না ধ্বংসী নিগদ্যতে॥

মাগধ পরিমাণং।

[পরিভাষা প্রদীপ]

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী আলোচনা করিলেও আমরা জানিতে পারি—ভেষজ দ্রব্যের জারণ-মারণ-মর্দ্দন-সন্তাপন সমস্তই তাহার জড় ধর্ম্ম নষ্ট করিবার জন্য। কেননা শক্তি না হইলে শক্তিকে আঘাত করিতে পারেনা।

হোমিওপ্যাথির যাহা মূলসূত্র—তাহাও অনন্ত আয়ুর্ব্বেদের এক ভগ্নাংশ। আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিয়া এই স্থানেই এ প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

যদ্বিষং ভক্ষণাদ্দেহে যদ্রূপ মুপলক্ষ্যতে।
তস্য তদগদং জ্ঞেয় মিত্যাচে হারীতঃ স্বয়ং॥

অর্থাৎ যে বিষ ভক্ষণ করিলে শরীরে যে যে লক্ষণ উপস্থিত হয়, সেই বিষই সেই লক্ষণ নিবারক অগদ (ঔষধ)—স্বয়ং হারতীঋষি একথা বলিয়াছেন। "বিষস্য বিষ মৌষধং"—ভারতের পুরাতন সিদ্ধান্ত। এখন পাঠক মহাশয় ভাবিয়া দেখুন—হোমিওপ্যাথি—আয়ুর্ব্বেদ মহা সাগরেরই একটী তরঙ্গ কি না?

শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ।

রসায়ন ও বাজীকরণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

——:*:——

এইবার বাজীকরণের কথা বলা যাউক। বাজীকরণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে ;—"যাহা বহু পুত্রজনক, সদ্যঃই স্ত্রীতে হর্ষজনক, যাহাতে অপ্রতিহত বলের সহিত স্ত্রীগমনে সামর্থ্য জন্মে, যাহাতে স্ত্রীলোকের অত্যন্ত প্রিয় হওয়া যায়, যদ্দ্বারা জরাগ্রস্ত পুরুষেরও শুক্রবৃদ্ধি প্রাপ্ত ও পুত্রোৎপাদন ক্ষমতা জন্মে, যাহাতে বহুশাখা বিশিষ্ট মহান চেতা বৃক্ষের ন্যায় মনুষ্য বহু অপত্য বিশিষ্ট হইয়া লোকের সম্মানভাজন হয়েন, যাহা দ্বারা ইহ ও পরলোকে সন্তান মূলক যশঃ, শ্রী, বল ও পুষ্টিলাভ করা যায়, তাহাকে বাজীকরণ বলে।"

বাজীকরণ ঔষধ সেবন সম্বন্ধে শাস্ত্রকার বলিয়াছেন ;—"আত্মবান পুরুষ নিত্যই

বাজীকরণ ইচ্ছা করিবেন। কারণ বাজীকরণ দ্বারা পুত্র হয় এবং পুত্র হইতে ধর্ম্ম, অর্থ, প্রীতি ও যশোলাভ হয়। সুতরাং বাজীকরণ ঐ সকল লাভের হেতু স্বরূপ" শাস্ত্রে অপুত্রক পুরুষকে ছায়াহীন, বলহীন, একশাখাবিশিষ্ট এবং পূতিগন্ধযুক্ত বৃক্ষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, অপিচ শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"অপুত্রক পুরুষ চিত্রিত দীপের ন্যায়, জলশূন্য পদার্থের ন্যায়, আকৃতি বিশিষ্ট কিন্তু অধাতব পদার্থের ন্যায় এবং তৃণ নির্ম্মিত প্রতিকৃতির ন্যায়। অপুত্রক পুরুষ প্রতিষ্ঠা রহিত, নগ্ন, একচক্ষুঃ এবং নিষ্ক্রিয়।"

বহু সন্তান বিশিষ্ট পুরুষ বহুমূর্ত্তি, বহুমুখ, বহুব্যূহ, বহুক্রিয়, বহুচক্ষুঃ, বহুজ্ঞান ও বহু আত্মাযুক্ত। বহুপুত্রক ব্যক্তি মঙ্গলময়, প্রশস্ত ধন্য, বীর্য্যশাখ এবং বহুশাখ বলিয়া প্রশংসিত হয়েন। প্রীতি, বল, বিস্তার, বিভব, কুল, যশ, প্রভৃতি অপত্য সংশ্রিত। সুতরাং যিনি ঐ সকল গুণ লাভে ইচ্ছা করেন, তিনি যেন নিত্য ভোগ সুখকর বীর্য্য বর্দ্ধন এবং অপত্য বর্দ্ধন বাজীকরণ পরায়ন হয়েন।

মনের হর্ষোৎপাদনকারিণী স্ত্রীই বাজীকরণের প্রধান ক্ষেত্র। কারণ অভিলষিত রূপ রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের এক একটীর দ্বারাই মনের প্রীতি সম্পাদিত হইয়া থাকে। স্ত্রী শরীরে ঐ পাঁচটীই যখন একত্র অবস্থিত, তখন স্ত্রীই যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হর্ষোৎপাদনকারিণী তাহাতে আর সন্দেহ কি। স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোথাও রূপ-রসাদি পাঁচটীর একত্র সমাবেশ দেখা যায়না। স্ত্রীতেই বিশেষরূপে প্রীতি, অপত্য, ধর্ম্ম, অর্থ, লক্ষ্মী ও লোক সকল প্রতিষ্ঠিত। তবে শাস্ত্রকার ইহাও বলিয়াছেন, যে স্ত্রী সুরূপা, যৌবন সম্পন্না, সুলক্ষণা, বশীভূতা এবং সুশিক্ষিতা সেই স্ত্রীই শ্রেষ্ঠ বাজীকরণ।

শাস্ত্রকার বাজীকরণ সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন,—"বিবিধ মনোজ্ঞ ভোজ্যদ্রব্য আহার, নানাবিধ পানীয় দ্রব্য, পান, শ্রুতি মধুর বাক্য শ্রবণ, সুখকর স্পর্শ, জ্যোৎস্নারাত্রি, নবযৌবন সম্পন্না কামিনী, শ্রুতি মধুর সঙ্গীত শ্রবণ, তাম্বুল ভক্ষণ, মদ্যপান, পুষ্পমাল্য ধারণ, ও মনের প্রফুল্লতা, প্রভৃতি দ্বারা বাজীকরণ হইয়া থাকে।"

বাজীকরণ ত্রিবিধ, যথা, শুক্রজনক, শুক্র প্রবর্ত্তক এবং শুক্রের জনক ও প্রবর্ত্তক। ঘৃতাদি শুক্রজনক, কুঁচের মূল চূর্ণ প্রভৃতি শুক্র প্রবর্ত্তক এবং গোধূম, মাষ কলায় ডিম্ব প্রভৃতি শুক্রজনক ও প্রবর্ত্তক।

এক্ষণে বাজীকরণ যোগ সকল লিখিত হইতেছে। এই সকল যোগ সুস্থ ব্যক্তির শুক্রবর্দ্ধক এবং ক্ষীণ শুক্র ও শুক্র দৌর্ব্বল্য বিশিষ্ট পুরুষের পক্ষে পরম হিতকর। সুস্থ ব্যক্তি এই সকল যোগ সেবন করিলে শুক্র ক্ষয় জনিত কোন প্রকার রোগ জন্মিতে পারে না।

পাঁঠার কোষ জলে সিদ্ধ করিয়া লইবে। পরে একটী পাত্রে দুগ্ধজাত গব্য ঘৃত চড়াইয়া তাহাতে সেই জল সহ কোষ, সৈন্ধব লবণ, এবং পিঁপুল চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া পাক করিয়া লইবে। ইহা অত্যন্ত রতি শক্তিবর্দ্ধক।

পাঁঠার কোষ এক ছটাক, দুগ্ধ আধ সের, এবং জল দুই সের একত্র সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে অর্থাৎ আধ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া দুগ্ধ গ্রহণ করিবে। এই দুগ্ধ দ্বারা খোসা রহিত তিল সাতবার ভাবনা দিয়া সেই তিল সেবন করিলে রতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়। ইহা অপেক্ষা অল্প মাত্রায় ভাবনার জন্য দুগ্ধ প্রস্তুত করিতে হইলে, পাঁঠার কোষের

আটগুণ পরিমাণ দুগ্ধ এবং দুগ্ধের চারিগুণ জল একত্র সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া লইবে।

ভূমিকুষ্মাণ্ড চূর্ণ, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসে সাত দিন ভাবনা দিবে। এই চূর্ণ ঘৃত ও মধু সহ সেবন করিলে বাজীকরণ হয়। এইরূপে আমলকীর চূর্ণ আমলকীর রসে সাতদিন ভাবনা দিয়া ঘৃত, চিনি ও মধুসহ সেবন করিলেও ফল হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া দুগ্ধ পান করা কর্ত্তব্য।

ভূমি কুষ্মাণ্ড বাটিয়া দুগ্ধ ও ঘৃতসহ সেবন করিলে যৌবন দীর্ঘস্থায়ী হইয়া থাকে।

আলকুশী বীজের শস্য এবং কুলেখাড়ার বীজ চূর্ণ করিয়া বা বাটিয়া চিনি ও ধারোষ্ণ দুগ্ধ সহ পান করিলে রতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়। দুগ্ধ দোহন কালে যতক্ষণ উষ্ণ থাকে, ততক্ষণ তাহাকে ধারোষ্ণ দুগ্ধ বলে।

কুলেখাড়ার বীজ চূর্ণ বা কুঁচের মূল চূর্ণ, চিনি ও ধারোষ্ণ দুগ্ধ সহ সেবন করিলে বাজীকরণ হয়।

শতমূলী ও কুঁচের মূল চূর্ণ করিয়া চিনি ও ধারোষ্ণ দুগ্ধসহ পান করিলে অথবা যষ্টিমধু চূর্ণ ঘৃত ও মধু সহ সেবন করিলে রতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়।

গোক্ষুর বীজ, কুলে খাড়ার বীজ, শতমূলী, আলকুশী বীজ, গোরক্ষ চাকুলের মূল ও বেড়েলার মূল ইহাদের চূর্ণ সমভাগে একত্র করিয়া সহ্যমত মাত্রায় দুগ্ধ সহ রাত্রে সেবন করিলে বাজীকরণ হয়।

মাষকলায় ঘৃতে ভাজিয়া দুগ্ধ ও চিনি সহ পাক করিয়া পায়স প্রস্তুত করিবে। ইহা উত্তম বাজীকরণ। দধির সর, চিনি, মধু, মরিচ চূর্ণ, ছোট এলাচ চূর্ণ ও বংশলোচন চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া সুগন্ধযুক্ত ভাণ্ডে রাখিবে। ঘৃত বহুল যষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন সেবন করিয়া এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে বর্ণ, স্বর, বল ও রতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়।

এই স্থলে দধির সর এক পোয়া, চিনি এক ছটাক, ঘৃত ১ তোলা, মধু ১ তোলা এবং অন্যান্য দ্রব্য উপযুক্ত মাত্রায় (এক সিকি বা তদ্রূপ) গ্রহণ করিতে হইবে।

টাটকা মাংস ও রোহিত মৎস্য আহার করিলে বাজীকরণ হয়। বিশেষতঃ বড় পুঁটি (সরল পুঁটী) ঘৃতে ভাজিয়া সেবন করিলে রতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়।

পিঁপুল, মাষকলায়, শালিধান্যের তণ্ডুল, যব ও গোধুম একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃত সহ পিষ্টক প্রস্তুত করিবে। এই পিষ্টক ভক্ষণ করিয়া চিনি মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিলে রতি শক্তি বর্দ্ধিত হয়। এই স্থলে পিঁপুল চূর্ণ এক সিকি এবং অন্যান্য দ্রব্য উপযুক্ত মাত্রায় লইতে হইবে।

কাঁকড়া, কচ্ছপ ও কুম্ভীরের ডিম্ব ভক্ষণ করিলে অত্যন্ত শুক্রবৃদ্ধি হয়।

অশ্বত্থের ফল মূল, ছাল ও কুঁড়ির সম ভাগে দুই তোলা, দুগ্ধ ১৬ তোলা এবং জল ৬৪ তোলা একত্র পাক করিয়া ১৬ তোলা থাকিতে নামাইয়া লইবে। এই দুগ্ধ ছাঁকিয়া চিনি ও মধুসহ পান করিলে রতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়।

মাষকলায় চূর্ণ, ঘৃত ও মধু সহ সেবন করিয়া দুগ্ধ পান করিলে রক্তি শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

প্রথম প্রসূতা গাভীর বৎস বড় হইলে তাহার দুগ্ধ পান করিলে অথবা যে গাভী মাষ কলায়ের পত্র ভক্ষণ করে, তাহার দুগ্ধ পান করিলে বাজীকরণ হয়।

আলকুশী বীজ চূর্ণ ও গোধূম চূর্ণ দুগ্ধ সহ পাক করিয়া ঘৃত মিশ্রিত করিয়া শীতল হইলে ভোজন করিবে; এবং পরে দুগ্ধ পান করিবে। ইহা উত্তম বাজীকরণ।

চড়াই পাখীর মাংস তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করিয়া দুগ্ধ পান করিলে রতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়। কলায়ের যূষের সহিত ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিয়া দুগ্ধ পান করিলে বাজীকরণ হয়। মৎস্য ও হংস, ডিম্ব—ঘৃতে ভাজিয়া খাইলে বাজীকরণ হয়।

আলকুশী বীজ, মাষকলায়, পিণ্ডখর্জ্জুর, শতমূলী, পানিফল ও কিসমিস সমানভাগে মোট দুই সের, দুগ্ধ চারি সের এবং জল চারি সের একত্র সিদ্ধ করিয়া চারি সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে, পরে তাহার সহিত চিনি তিন পোয়া, বংশলোচন তিন পোয়া এবং নূতন ঘৃত দেড় সের মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ সহ্যমত মাত্রায় সেবন করিয়া ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিলে বহু পুত্র লাভ করা যায়।

টাট্‌কা রোহিত মৎস্য ঘৃতে ভাজিয়া দধি, দাড়িমের রসের সহিত প্রস্তুত ছাগমাংসের যূষের সহিত পাক করিয়া অগ্রে মৎস্য, পরে যূষ ইহা সেবন করিবে, বৃষ্য ও পুত্রজনক।

মৎস্য বা মাংস কুট্টিত করিয়া তাহার সহিত হিং, সৈন্ধব, ধনে ও গোধূম চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ঘৃতে পাক করিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করিবে। ইহা উত্তম বাজীকরণ।

ছাগাদির মাংস রসে দধি ঘৃত, লবণ এবং দাড়িমের রস সংযোগে মৎস্য পাক করিবে। মাংস রস মৎস্যের মধ্যে প্রবেশ করিলে উহা পেষিত ও কণ্টক শূন্য করিয়া মরিচ, জীরা, ধনে, অল্প হিং এবং নূতন ঘৃত মিশ্রিত করিবে। অনন্তর মাষকলায়ের ধুলি প্রস্তুত করিয়া উক্ত মৎস্য তন্মধ্যে পুর দিয়া ঘৃতে ভাজিয়া লইবে। ইহা পুষ্টিকর, বলকর, পুত্রোৎপাদক, শুক্রবর্দ্ধক এবং হর্ষজনক।

বৃষ্যলপ্সিকা—চিনি দশসের, নূতন ঘৃত পাঁচ সের মধু আড়াই সের, এবং জল আড়াই সের একত্র পাক করিবে। অনন্তর ঘন হইয়া আসিলে উহাতে গোধূম চূর্ণ আড়াইসের নিক্ষেপ করিবে। অল্প পাকের পরে নামাইয়া শিলায় উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবনে রতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়।

যে সকল দ্রব্য মধুর, স্নিগ্ধ, জীবনীশক্তি বর্দ্ধক, পুষ্টিকর, গুরু ও মনের হর্ষজনক তৎসমস্তই বৃষ্য, সুতরাং বাজীকরণের জন্য এবম্বিধ দ্রব্য প্রয়োগ করিবে।

শ্রী—

ছাত্র জীবনে—স্বাস্থ্যরক্ষা।

—:*:—

আয়ুর্ব্বেদের সহযোগী সম্পাদক কবিরঞ্জন মহাশয় এবার কুম্ভকারকে দিয়া কর্ম্মকারের কাজ করাইবেন। আমায় নাকি 'আয়ুর্ব্বেদ' পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেই হইবে! অথচ আয়ুর্ব্বেদ শব্দের যোগরূঢ় অর্থটাই আমার জানা নাই। সেক্ষপিয়র-মিল্টন্ ও চরক-সুশ্রুত যে